অহল্যা

(কথাগ্রন্থ)

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্যচৌধুরী

প্রণীত ও প্রকাশিত।

ময়মনসিংহ।

নূতন সংস্করণ।

[মূল্য ।।০ আনা।]

কলিকাতা ;

৬/১ নং যোড়াসাঁকো, পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
"কলিকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৯৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

বহুদিন হইল ইংরাজি ভাষায় একখানি কথাগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় গ্রন্থের নাম স্মরণ নাই।

এই গ্রন্থের দুইটী পরিচ্ছেদ সেই ইংরাজি পুস্তকখানির ছায়া অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্য স্বর্গগত জনক রাধানাথ সান্যাল মহাশয়।

দেব,

আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তুমি আমাকে আমার শৈশব সময়ে দান করিয়াছিলে। সেরূপ নিস্বার্থ দান জগতে অতি দুর্ল্লভ।

যে সময়ে সংসার ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তদীয় চক্রে আমাকে পেশন করিতেছিল, সেই সময়ে তুমিই আমার এক-মাত্র অবলম্বন ছিলে। তোমার নিস্বার্থ ভালবাসা লাভে বঞ্চিত হইলে এই জীবন-দীপ সেই সময়েই নিবিয়া যাইত। যখন এই কপর্দ্দক ভিখারী সাহসে নির্ভর করিয়া কঠোর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সেই সময়ে একমাত্র তুমি ভিন্ন অপর পূজনীয় আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সকলেই পরিহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় আমার হরিষে-বিষাদ, তাহার কিছুদিন পরেই তুমি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য কাঁদাইয়া অনন্তধামে গমন করিলে।

তোমার পবিত্র-মূর্ত্তি স্মরণে উদিত হইলে, হৃদয়ের সকল অশান্তি দূর হয়। পিতঃ! জীবনে ইহাই আমার ঘোর দুঃখ যে, সংসারিক সচ্ছলতার সময়ে তোমার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না।

দেব,

আমি অযোগ্য হইলেও অধম নহি। কারণ, আমি তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আমার আর কিছু নাই।

তোমার পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া উদ্দেশে তোমার চরণে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

তোমার স্নেহের

অমরনাথ।
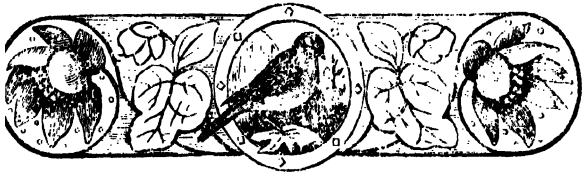
অহল্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!
লাগিলে গায় গায়,
সহজে ভেঙ্গে যায়,
রাখহে ভালবাসা বাসনা হীন,
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

পঞ্জাবের অন্তর্গত বহু জনপূর্ণ করাচী গ্রাম। করাচীর পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবল সিন্ধুনদ কল কল নাদে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামে একটী ব্যতীত আর অট্টালিকা নাই। অট্টালিকাটী সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত। সেই অট্টালিকার অন্যতর প্রকোষ্ঠে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা ও তাহার মাতা উভয়ে কি কথোপকথন করিতেছেন। বালিকার মুখে প্রফুল্লতা নাই, চক্ষু ছল ছল করিতেছে; জননীর প্রশ্নের কি উত্তর দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পারিল না। কণ্ঠ অবরুদ্ধ

হইয়া আসিল। মাতা পুনরায় অধীর ভাবে ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহল্যা! আমার কথার কি উত্তর দিবি না?

এবার বালিকার কথা ফুটিল। শত-বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে বালিকা বলিল, মা! গৌতমকে আমি সহোদরের ন্যায় ভাল-বাসি, দাদা বলিয়া ডাকি। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিব না। মা! তোমার পায়ে ধরি, এ সম্বন্ধে তুমি আর আমাকে কোন কথা বলিও না।

মাতা, কন্যাকে আর একটী কথাও না বলিয়া, রাগভরে সেই কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন। অহল্যা যেখানে উপবেশন করিয়াছিল, সেই স্থানেই রহিল। বহুক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল— ভগবান্! তোমার সৃষ্টিতে এত বৈষম্য কেন? সকলেই তোমার সন্তান, তবে এই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ এত পূজ্য কেন, আর আমরা হড্ডিক জাতি বলিয়া কেন এত ঘৃণ্য হইলাম? দয়াময়! এ বৈষম্য কি দূরীকৃত হইবে না? সমস্ত হিন্দুজাতি কি সাম্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে না? বালিকা আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। চক্ষু হইতে মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থলের উপরে পতিত হইল। অহল্যা আবার বলিতে লাগিল, পিতঃ! কুটীর ভাঙ্গিয়া কেন অট্টালিকা বানাইলে? এ হতভাগিনীকে সুশিক্ষিতা করিবার নিমিত্ত কেনই বা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলে? যদি চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে থাকিতাম, যদি সেই ভগ্ন কুটীরেই বাস করিতাম, তবে ত এ হৃদয়ে এত দুরাশা স্থান পাইত না। অহল্যা আর ভাবিতে

পারিল না, অদূরে পর্য্যঙ্কে দুগ্ধ-ফেণ-বিনিন্দিত শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল।

অহল্যার পরিচারিকার নাম পার্ব্বতী। অহল্যা তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত। পার্ব্বতীর বর্ণটা কাল। কিন্তু বর্ণ কাল হইলেও মনটী ভাল। আঠার বৎসর বয়সের সময়ে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের এক বৎসর পরেই তাহার পতি পর-লোক গমন করে। একুশ বৎসর বয়সের সময়ে পার্ব্বতী অপর একটী হড্ডিক যুবককে বরমাল্য প্রদান করে। দুর্ভাগ্য ক্রমে তিন বৎসর পরে বাতরোগে দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু হয়

সে সময়ে এবং এখনও চণ্ডাল, হড্ডিক প্রভৃতি ইতর জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল ও আছে।

দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুতে পার্ব্বতী হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাই-য়াছিল। পার্ব্বতী শৈশবে পিতৃ মাতৃ হীন। পিতৃ-কুলে অথবা স্বামী-কুলে নিকট সম্পর্কীয় কেহই ছিল না। সে দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় কোন লোকের সহিত মিশিত না। ক্রমে তাহার সঞ্চিত অর্থ ফুরাইল। অর্দ্ধাহারে অনাহারে তাহার শরীর ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। অহল্যা পার্ব্বতীকে পূর্ব্ব হইতেই ভালবাসিত; তাহার শোচনীয় অবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া পিতার অনুমতি গ্রহণ করতঃ পার্ব্বতীকে বাড়ীতে আনয়ন করিল। দুই বৎসর হইতে পার্ব্বতী অহল্যার বাড়ীতে আছে। ভরণ পোষণের জন্য তাহাকে আর ভাবিতে হয় না।

পার্ব্বতী অসময়ে অহল্যাকে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে দেখিয়া ধীর পদক্ষেপে অথচ ব্যস্তভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে অহল্যার নিকটে যাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, অহল্যা দিদি! তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? এ সময়ে শু'লে যে? বেলা হইয়াছে স্নান করিবে না? অহল্যা প্রিয় সহচরী পার্ব্বতীর প্রশ্নের কোন প্রত্যুত্তর দিল না। পার্ব্বতী পুনঃ পুনঃ স্নান করিবার জন্য জেদ্ করিতে লাগিল।

অগত্যা অহল্যা পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে কাতর চক্ষে তাকাইয়া রহিল। যেন কি কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। পার্ব্বতী আর কোন কথাই না বলিয়া অহল্যার মাথায় তেল দিতে বসিল। সে সেই এক রাশি চুল ক্রমে ক্রমে তৈলসিক্ত করিল। তার পর গাত্রমার্জ্জনী খানি লইয়া অহল্যার হাতে ধরিয়া টানিতে লাগিল। অহল্যা কোন কথাই না বলিয়া কলের পুত্তলির ন্যায় উঠিল। পার্ব্বতী অহল্যার হাত ধরিয়াই সিন্ধুনদাভিমুখে গমন করিল। অন্য অন্য দিন অহল্যা সিন্ধুনদের তটে বসিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা শরীর ঘর্ষণ করিত, আজ তাহার মানসিক অবস্থা ভাল নহে—তাড়াতাড়ি পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া জলে নামিল। সিন্ধুনদ অতি গভীর, তটভূমিও অতি উচ্চ। হঠাৎ পার্ব্বতী ভয়-চকিত-স্বরে ভয়ঙ্কর চিৎকার করিয়া উঠিল। অহল্যাও কি একটা বিকটাকার পদার্থ সম্মুখে অনুমান শত হস্ত দূরে দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্ত না যাইতেই জলে কোন ভারি বস্তু পতনের শব্দ তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সহসা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিয়ৎকাল পরেই দেখিল কিছু দূরে জলোপরি গৌতম। গৌতমকে যেন কিসে

ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গৌতম সেই অবস্থায় উচ্চৈঃ
স্বরে বলিল,—অহল্যা! তোমাকে না পাইলে এ দগ্ধ প্রাণ
পরিত্যাগ করিব সংকল্প করিয়াছিলাম। আজ সেই সুযোগ
ঘটিয়াছে। যখন দেখিলাম ভয়ঙ্কর কুম্ভীরটা তোমাকে গ্রাস
করিতে আসিতেছে, তখনই উচ্চ তটভূমি হইতে লম্ফ প্রদান
করিয়া তোমার সম্মুখে জলে পতিত হই। কুম্ভীর, সম্মুখে
আমাকে পাইয়া আমাকেই আক্রমণ করিয়াছে। অহল্যা!
আমি তোমার অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে
সঙ্গে একটী বৎসর কাটাইতেছি। আজ এই হতভাগ্য স্বীয়
জীবনের পরিবর্ত্তে তোমার অমূল্য জীবন রক্ষা করিতে পারিল,
ইহাই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি যে এত সুখে মরিব,
মরিবার সময়ে তোমার অমল-মুখ-কমল দেখিয়া মরিব, ইহা
স্বপ্নেও ভাবি নাই। অহল্যা! আমার অন্তিম অনুরোধ—
আর কখনও সিন্ধুজলে অবগাহন করিও না। গৌতমের আর
কথা বাহির হইল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। যেন
আরও কি বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার দেহ
জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল। অকালে গৌতম ইহলোক
হইতে চিরবিদায় লইল। পাঠক! গৌতমের আত্মা স্বর্গে
গমন করিল কি নরকস্থ হইল, বলিতে পার কি?

অহল্যা বহুক্ষণ সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।
তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। পার্ব্বতীও
স্তম্ভিতের ন্যায়। এমন সময়ে অহল্যার কর্ণে মাতৃস্বর প্রবেশ
করিল। "এত বেলাতেও কি স্নান শেষ হয় না? আজকি

ঘাটেই থাকিবি?” অহল্যা আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর মাতা ও পার্ব্বতীর সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিল।

নায়কের প্রেম সম্ভাষণ, নায়িকার বিরহ দংশন, তার সঙ্গে হা, হুতাশ! মলয় বাতাস, কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন কিছুরই বর্ণনা হইল না—অথচ গৌতম কুম্ভীরের উদরস্থ হইল। পাঠক! তুমি নেহাৎ চটিয়াছ। কিন্তু কি করিব? সত্যের অনুরোধে বর্ণনার বাহবাটা লইতে পারিলাম না। “নিয়তি কেন বাধ্যতে,” স্মরণ করিয়া হতভাগ্য গ্রন্থকারকে ক্ষমা করিও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আশৈশব দৃঢ় ভক্তি পৌত্তলিকতায়
আছিল আমার, পিতঃ! জ্ঞানের নয়ন
বিকশিত হলো যবে, শিহরিল কায়
ইহার বিকৃতাবস্থা করি দরশন।
আশ্রয় পাদপচ্যুত লতার মতন,
প্রত্যেক বাতাস ভরে বিশ্বাস আমার
কাঁপিতে লাগিল; জ্ঞান আলোকে তেমন
মিশাইল অন্ধকার পূর্ব্ব সংস্কার—

নবীনচন্দ্র সেন।

রজনী এক যাম গত হইয়াছে—আজ শুক্লাষ্টমী। সুবিমল শারদীয় নভে শরচ্চন্দ্র এত হাসিতেছ কেন? তোমার ঐ সহাস্য আনন, আর তুমি হাসিয়া হাসিয়া যাহাদিগকে হাসাইতেছ, তাহাদের ঐ হাসিভরা মুখ দেখিয়া আমি যে অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারি না। মধ্যাহ্নে কমলিনীকে খুব হাসিতে দেখিয়াছিলাম, এখন কমলিনীর দশা একবার চাহিয়া দেখিয়াছ কি শশধর? সে হাসিভরা মুখ যে ম্লান হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। ভাগ্যবতি কুমুদিনি! তুমি পদ্মিনীর পরিম্লান

মুখচ্ছবি দেখিয়া বড়ই হাসিতেছ। হাস হাস কুমুদিনি! ভাল করিয়া হাসিয়া লও! সুদিনে কুদিনের কথা ভাবিও না। শশধর! ঐ দেখ তোমার স্নিগ্ধ কিরণে সিন্ধুনদ হাসিতেছে, জ্যোৎস্না বিধৌত ধবল সৌধ হাসিতেছে; কিন্তু ঐ ধবল সৌধের অভ্যন্তরে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা হাসিতেছে, না কাঁদিতেছে শশধর?

অট্টালিকার একটী প্রশস্ত কক্ষে অহল্যার পিতা ও মাতা শয্যায় শয়ন করিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। অহল্যার পিতা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্ব্বতীর নিকটে আজ সকালে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?

অহল্যার মাতা বলিলেন, করিয়াছিলাম।

পতি। অহল্যাকে রাচাইতে যাইয়াই গৌতম প্রাণ হারাইল। এখন বোধ করি অহল্যা গৌতমকে অবহেলা করার দরুণ নিতান্ত আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছে। আহা! গৌতমের ন্যায় শান্ত, শিষ্ট, সুশ্রী ছেলে হড্ডিক জাতির মধ্যে আর নাই।

পত্নী। আহা! গৌতমকে যেন আমি এখনও চ'খের সামনে দেখিতেছি। আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই অমন ছেলেকে জামাই ক'রে মনের সাধ পূরাইতে পারিলাম না। ভাল, এই করাচী গ্রামে এত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুসলমানের বাস, কই কেউ ত কারুর মেয়েকে লেখা পড়া শিখায় না? তুমি মেয়ের আব্দারে ভু'লে গেলে, মৌলবী রেখে পাঁচ বৎসর ধরে মেয়েকে লেখা পড়া শিখাইতেছ। ভদ্র ঘরে যা করে না, বেদে কোরাণে যা

নাই, আমরা হুড়িক জাতি হ'য়ে তাই করিলাম। এর ভোগ ভুগিতেই হইবে।

পতি। সে কথা যাক্। এখন পার্ব্বতী কি বলেছে, তাই বল।

পত্নী। পার্ব্বতী বল্লে, অহল্যার বিবাহ করিতে একেবারেই ইচ্ছা নাই। সে গৌতমকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিত। যদি কোন দৈব ঘটনায় গৌতম পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহা হইলে অহল্যা ধন-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী, সমস্ত প্রদান করিয়া বন-বাসিনী হইতে পারে, গৌতমের সামান্য সুখের জন্য সে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। সে যে কাহাকে বিবাহ করিবে, কি কোন্ সময়ে বিবাহ করিবে, তাহাও সে বলিতে পারে না। পার্ব্বতী বল্লে, সকলে যাহাকে বিবাহ বলে, অহল্যা তাহাকে বিবাহ বলে না। অহল্যা যাহাকে বিবাহ বলে, সে সব নাকি কেতাবের কথা। পার্ব্বতী তা বুঝ্‌তে পারে নাই, মনেও রাখ্‌তে পারে নাই।

হঠাৎ পার্শ্বের ঘর হইতে অহল্যার চীৎকার ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। ব্যস্ত ভাবে "কি হইল, কি হইল," বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা অহল্যার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে আবার পার্ব্বতীর চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। অতি দ্রুত তাঁহারা অহল্যার কক্ষ সমক্ষে যাইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। সজোরে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, অহল্যা! অহল্যা! পার্ব্বতি! পার্ব্বতি! বলিয়া তার-স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। বাটীর

ভৃত্যগণ শব্দ শুনিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলেই দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু দ্বার খুলিল না। উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া অহল্যার পিতা এক জন ভৃত্যকে কুঠার আনিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তিন চারি খানা কুঠার আনীত হইল। অহল্যার পিতা স্বয়ং কুঠারাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিতে লাগিলেন, ভৃত্যগণও সাহায্য করিল। বারম্বার কুঠারাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, অহল্যার পিতা মাতা তাড়াতাড়ি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অহল্যা অচেতনাবস্থায় শয্যায় পতিত রহিয়াছে। কক্ষের অপরদিকে ভিন্ন শয্যায় পার্ব্বতী মূর্চ্ছিতা। পার্ব্বতীর দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, অহল্যাকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত। অহল্যার পিতা মাতা উভয়ে যাইয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। অহল্যার মাতা অহল্যার মস্তক ক্রোড়োপরি স্থাপন করিয়া তাহার শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অহল্যার চৈতন্য নাই। নাসিকাগ্রে হাত দিয়া দেখিলেন, অতি মৃদু মৃদু শ্বাস বহিতেছে। এক জন ভৃত্য অহল্যার মস্তকে জল সেক করিতে লাগিল। অহল্যার পিতার আদেশে জনৈক ভৃত্য, হেকিম ও এক জন কবিরাজ ডাকিতে গেল, অপর ভৃত্য ভূতের ওঝা আনিবার জন্য অহল্যার মাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইল। এই সময়ে পার্ব্বতী মূর্চ্ছাবস্থাতেই আবার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। কি কারণে বলিতে পারি না, কিছু দিন হইতে অহল্যার পিতার আলয়ে স্বজাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রায় আসিত না। অদ্যকার রজনীর গণ্ডগোল শুনিয়া কয়েকটী আত্মীয় স্বজনও আসিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অহল্যার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক জন পার্ব্বতীর মস্তকেও জল সেক করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে হেকিম, কবিরাজ, ভূতের ওঝা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসক দ্বয় স্বীয় স্বীয় মতানুসারে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। উভয়ের মতেই বায়ুরোগ নির্ণীত হইল। ভূতের ওঝাও যথাসাধ্য বিকট মন্ত্রাদি দ্বারা অহল্যাকে ঝাড়িতে লাগিল। অহল্যার পিতা মাতা ও অপর আত্মীয় স্বজন এবং ভৃত্যবর্গ সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, অহল্যাকে অপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে। সকলের এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ এই যে, একই সময়ে চীৎকার করিয়া অহল্যা ও পার্ব্বতী উভয়ে কেন মূর্চ্ছিতা হইল। একটু একটু করিয়া পার্ব্বতীর চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল। ক্ষণ পরে পার্ব্বতীর সম্পূর্ণ চৈতন্যোদয় হইল। চৈতন্য লাভ করিয়াই সে "অহল্যা দিদি" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় সকলে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া উভয়ের মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পার্ব্বতী বলিল, "আমি ঘুমাইয়াছিলাম, হঠাৎ অহল্যা দিদির চীৎকার শুনিয়া জাগিয়া দেখি, অহল্যা দিদিকে একটা ভয়ঙ্কর সর্প কটি হইতে গলা পর্য্যন্ত জড়াইয়া ধরিয়া, মাথার উপরে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া আমি মূর্চ্ছিতা হই, তার পর আর জানি না।" তখন হেকিম ও বৈদ্য উভয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত অহল্যার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু সর্পাঘাতের কোনও লক্ষণই পাইলেন না। অহল্যার

পিতার আদেশে সুবিখ্যাত সর্পবিৎ চিকিৎসকগণ আনীত হইল, তাঁহারাও বিষের কি দংশনের কোন লক্ষণই পাইল না। অহল্যার মাতা এবং আরও কতিপয় লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, অপদেবতাই সর্পের আকার ধারণ করিয়া অহল্যাকে আশ্রয় করিয়াছে। ক্রমে রজনী অবসান হইল। প্রভাত সময়ে অহল্যা একবার চক্ষুরুন্মীলন করিল। মা! মা! শব্দ করিয়া আবার মূর্চ্ছিতা হইল।

মধ্যাহ্ন অতীত হইল, তথাপি অহল্যার আর চেতনা জন্মিল না। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেবও অস্তাচলে গমন করিলেন। রজনী আগতপ্রায়। ধীরে ধীরে অহল্যার চেতনা জন্মিতে লাগিল। ভিষকদ্বয় সতর্কতার সহিত অহল্যার তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অহল্যা সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। মৃদুস্বরে হেকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, অহল্যা! এরূপ করিতেছ কেন? অহল্যা সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! আমি সর্পের কবল হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইলাম? হেকিম তাহাকে কথা কহিতে নিরস্ত করিয়া, বলকারক ও সুনিদ্রার ঔষধ সেবন করাইলেন। অহল্যার কক্ষে অধিক লোকের সমাগম না হয়, গণ্ডগোলে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া ভিষকদ্বয় স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। আত্মীয় স্বজন ভৃত্যবর্গ সকলেই স্থানান্তরে গেল; কেবল অহল্যার পিতা ও মাতা এবং পার্ব্বতী অহল্যার পরিচর্য্যার জন্য সেই গৃহে রহিলেন। কিয়ৎকাল পরেই অহল্যা গাঢ় নিদ্রায় অভি-

-ভূতা হইল। নিদ্রাবেশে অহল্যার বদন সরোজ কখন বিকশিত কখন মুদিত হইতেছিল। অহল্যার হৃদয়াকাশে এই যেন সূর্য্যদেব উদিত হইয়া কিরণ জাল বিস্তার করিতেছেন, আর তাহার মুখপদ্ম স্মিত ভাব ধারণ করিতেছে, পরক্ষণেই যেন হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে মুখপদ্ম ও মলিন হইয়া যাইতে ল এইরূপ আলো ও অন্ধকার অহল্যার হৃদয়ে ঘন ঘন ক্রীড়া করিতেছিল। যামিনীর শেষ ভাগে অহল্যা স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিল,—পরিধানে শ্বেত বস্ত্র, অঙ্গে শ্বেত অঙ্গরাখা, গলদেশে শুভ্র উত্তরীয় বিলম্বিত, মস্তকে ধবল উষ্ণীষ, দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু, আয়ত বিস্ফারিত উজ্জ্বল জ্যোতিবিশিষ্ট নেত্রদ্বয়, প্রশস্ত বক্ষস্থল, দীর্ঘাকার, তেজঃপুঞ্জ দিব্য কান্তি একজন মহা পুরুষ, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক খানি গ্রন্থ,—ধীরে ধীরে অহল্যার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার শরীরের স্বর্গীয় সৌরভে সেই কক্ষ পরিপূরিত হইল। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ মধুর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"অহল্যা! সর্পের ভয়ে তোমার চেতনা লুপ্ত হইয়াছিল কেন? সর্প কি দেখিতে কদাকার? সর্পের শরীর কেমন মসৃণ, কেমন চিক্কন, কেমন নয়ন-মুগ্ধকর উজ্জ্বল বর্ণ! সর্পের ফণা, তদুপরি বিচিত্র চক্র, এ সমস্ত কি সুদৃশ্য নহে? তবে তাহাকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূতা হইলে কেন? সর্প—বিষধর, তাহার স্বভাব খল, ইহা ভাবিয়াই কি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলে? অহল্যে! তুমিও কি মানবের আকারে সর্পিনী নও? তুমিও ত সর্পের ন্যায় অপূর্ব্ব রূপবতী!

তোমার রূপ অলৌকিক—তোমার লাবণ্য অনুপম—তোমার সর্ব্বাঙ্গ নিখুঁৎ। তোমার ন্যায় সুন্দরী জগতে দুর্লভ। কিন্তু সর্পে আর তোমাতে প্রভেদ কি অহল্যে? তোমার হৃদয় যে হলাহলে পূর্ণ! বৎস! বাহিরের সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য নয়, অন্তরের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। শুন অহল্যে! আমি অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রেরিত, আমার নাম মহম্মদ। আমার দক্ষিণ হস্তে যে গ্রন্থ দেখিতেছ, ইহা ঈশ্বরের বাণী "কোরাণ"। তুমি অসার পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রচারিত সত্য সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিতা হও। তোমার পরিণাম শুভ হইবে। আরও শুন বৎস! যাহাতে ভবিষ্যতে তোমার পরম শুভ হইবে তাহা বলিতেছি। এই করাটী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা কর। বাদসাহ হুমায়ুনের শেষ অনুরোধ কি তোমার পিতা বিস্মৃত হইয়াছেন?" সহসা স্বর্গীয় পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। অহল্যা নিদ্রান্তে জাগরিতা হইয়া কক্ষের চারি দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন চির নিদ্রার পর সে পুনর্জ্জীবিতা হইল। অহল্যা শয্যা ত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহীতলে ধন্য তব পরাক্রম কাল।
পড়িয়ে তোমার করে, অই হের নৃত্য করে,
বাল, বৃদ্ধ, সম্রাট, রাখাল।
পুনঃ হের আর বার, ঝরিতেছে অশ্রুধার,—
করিতেছে হাহাকার, হাসিছে আবার!
কত রঙ্গে কর খেলা, অদ্ভূত তোমার লীলা,
নাচাও পুতুল সম বিপুল সংসার।
(দুরাশা-কাব্য।)

১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে পঞ্জাব প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। প্রথমে লোকে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আহারের সংস্থান করিতে লাগিল। শেষে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে স্ত্রী-পুত্র, জমি-জমা কেহ ক্রয় করে না। কে করিবে? বহু লোকে অখাদ্য খাইয়া রোগে মরিল, অনেকে অনাহারে জীবন হারাইল। সে বৎসর দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের প্রকোপে পঞ্জাবের এক চতুর্থাংশ লোক ইহ জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। অহল্যার পিতা মাতার অবস্থা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিল। দুই দিন হইল তাহাদের উদরে অন্ন কি অন্য কোন প্রকার খাদ্য প্রবেশ করে নাই। অহল্যার বয়ঃক্রম সবে চারি বৎসর মাত্র। সে

ক্ষুধার জ্বালায় প্রায় মৃতবৎ। অহল্যার মাতা এক এক বার অহল্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখে স্তন দিতেছেন, হায়! স্তনে দুধ নাই! অনাহারে দুধ শুখাইয়া গিয়াছে। থাকিলেও চারি বৎসরের মেয়ের কেবল স্তনের দুগ্ধে ক্ষুধা মিটিবে কেন? অহল্যার পিতা এ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া, সিন্ধু নদের তীরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। অশ্রুপূর্ণ-লোচনে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বিপদ-ভঞ্জন ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া গোচারণ মাঠে গেলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া, আগ্রহের সহিত গোময় আহরণ করিতে লাগিলেন। যত টুকু গোময় একেবারে আনিবার শক্তি ছিল, তত টুকু গোময় লইয়া সিন্ধুনদের কুলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সিন্ধু জলে গোময় ধৌত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ চণক ইত্যাদি শস্য প্রাপ্ত হইলেন। সাত আট বারের পরিশ্রমে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইলেন, কুটীরে আসিয়া তাহাই অগ্নি ও জল সংযোগে সিদ্ধ করিয়া সকলে যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিলেন। অহল্যার পিতা আবার কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া সিন্ধু তীরে যাইয়া বসিলেন। এ ভাবে আর কদিন চলিবে? মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিতেছেন; স্ত্রী, কন্যার মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক জন অশ্বারোহী অতি দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া

সেই দিকে আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব সিন্ধুর অতি তীরে পঁহুছিল। বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া অশ্বারোহী অশ্ব সহ সিন্ধু গর্ভে পতিত হইলেন! অশ্বারোহী এতাদৃশ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, সন্তরণ দ্বারা তীরের নিকটবর্ত্তী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি জলমগ্ন হইলেন। অহল্যার পিতা সেই অবস্থাতেও অশ্বারোহীর আশু বিপদ দেখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সন্তরণ দ্বারা কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন অশ্বারোহী তখনও জীবিত রহিয়াছেন। জল হইতে শরীর ভাসাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। এইবার অহল্যার পিতা তাঁহার কেশ মাত্র দেখিতে পাইলেন—অমনি সেই সুদীর্ঘ কেশ দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়রূপে ধরিয়া তীরের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় তীর প্রাপ্ত হইলেন। তীরে উঠিয়া দেখিলেন অশ্বারোহীর চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে মাত্র। অহল্যার পিতা আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া সশস্ত্র অশ্বারোহীকে এক খানি ছেঁড়া মাদুরের উপরে শয়ন করাইলেন। এবং তাঁহার কটীদেশ হইতে অস্ত্রগুলি খুলিয়া, সহধর্ম্মিণীকে মুমূর্ষুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অগ্নিদ্বারা সেঁকিতে বলিলেন। তিনি অশ্বের উদ্দেশে পুনরায় সিন্ধুনদের অভিমুখে যাইয়া দেখিলেন, দূরে অশ্বটী স্রোতোপরি ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি সিন্ধুর তীরে তীরে অনেকটা দৌড়াইয়া যাইয়া অবশেষে জলে নামিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পত্নী, কন্যা এসময়ে ভুলিয়া গিয়াছেন,

শরীরে যেন দ্বিগুণ বলের সঞ্চার হইয়াছে। অহল্যার পিতা অত্যন্ত সন্তরণ পটু ছিলেন, অশ্বটীকে টানিয়া তীরে আনিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই অশ্ব প্রাণত্যাগ করিল। অশ্বপৃষ্ঠে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল, তিনি তাহা লইয়া পুনরায় কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং উভয়ে মুমূর্ষুর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু-কাল পরে তাঁহারা পুনরায় বহু ঘোটকের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন। অহল্যার পিতা কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া দেখি-লেন, প্রায় একশত অশ্বারোহী দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিতেছে। অশ্বের ক্ষুরভরে যেন মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। অনতি বিলম্বে অশ্বারোহীগণ সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্বের বেগ সংযত করিল। সিন্ধুনদের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া তাহারা পরস্পর কি কথোপকথন করিতে লাগিল। এক জন অগ্রসর হইয়া অহল্যার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "এদিকে কি এক জন অশ্বারোহী পুরুষ আসিয়া ছিলেন" ? অহল্যার পিতার জানিনা কি কারণে নবাগত অশ্বারোহীগণকে পূর্ব্ব অশ্বারোহীর শত্রু বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, তিনি বিনয়ের সহিত সেলাম করিয়া বলিলেন, "হাঁ খোদাবন্দ ! একজন অশ্বারোহী বীরপুরুষ এইদিকে অতি বেগে অশ্বচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, সিন্ধু-নদের অতি তীরে পঁহুছিয়াও তিনি অশ্বের বেগ সংযত করেন নাই। শেষে অশ্ব সহ নদে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছেন। এস্থানে নদ অত্যন্ত গভীর, সুতরাং স্রোতের বেগ প্রবল, অশ্বারোহী চেষ্টা করিয়াও তীরে উঠিতে সমর্থ হন নাই।" নবাগত অশ্বারোহীগণ অহল্যার পিতার মুখে পূর্ব্বাগত

অশ্বারোহীর পরিণাম অবগত হইয়া, তাঁহারা পরস্পর কিছু কাল কথোপকথন করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই অশ্বে কশাঘাত করিয়া যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকেই চলিয়া গেলেন। অহল্যার পিতা সেই অশ্বারোহীদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে আর দেখা গেল না। অহল্যার পিতা কুটীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সহ-ধর্ম্মিণীকে বলিলেন, অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছি, অশ্ব হইতে যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছি, তন্মধ্যে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া আছে; সে গুলি এরূপ ভাবে কুটীরে রাখা কর্ত্তব্য নহে। মৃত্তিকার নিম্নে পুঁতিয়া রাখা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আগন্তুকের চিকিৎসা ও পথ্যাদির জন্য এবং আমাদেরও প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। আগন্তুক অচৈতন্য, তাঁহার অনুমতি গ্রহণের উপায় নাই। আমরা এই দুঃসময়ে প্রাণ-ধারণোপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিলে তাদৃশ দোষের কার্য্য হইবে না। বিশেষতঃ আমরা ক্ষুধার জ্বালায় জীবন্মৃত-প্রায় হইয়াছি। আমরা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে আগন্তুকের সেবা শুশ্রূষাই বা কে করিবে? অহল্যার মাতা এ প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। অহল্যার পিতা কুটীরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া আগন্তুকের দ্রব্যাদি খুলিয়া দেখিলেন, ছয়টী থলিয়া পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা, এক জোড়া অতি উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল, একটী হীরক-খচিত স্বর্ণ-কৌটা, দুই বোতল সিরাজ মদ্য, আর কয়েক খানা উৎকৃষ্ট পরেঠা-রুটী। অহল্যার পিতা দুইটী মাত্র স্বর্ণ-মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া বক্রি স্বর্ণ-মুদ্রা গুলি ভূগর্ভে প্রোথিত করিলেন।

এক খানি রুটীর কিয়দংশ অহল্যার মাপে বালিকাটীর জন্য চাহিলেন, অহল্যার পিতা একটু ইতস্তত করিয়া পরে তাহা প্রদান করিলেন। বালিকা অতি আহ্লাদের সহিত তাহা আহার করিল। অহল্যার পিতা আগন্তুকের সর্ব্বশরীর শালের দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। রুটী ও সুরা যথাস্থানে রাখিয়া তিনি একজন সুচিকিৎসকের অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। অপরাহ্ণে চিকিৎসক সহ কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসক আগন্তুককে বহুক্ষণ বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। নাড়ীর গতি, চক্ষু, জিহ্বা, সমস্ত দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ বদনে বলিলেন "ভীষণ জ্বর হইয়াছে, জীবনের আশা কম; তবে ভালরূপে চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্যলাভ করিলেও করিতে পারে।

অহল্যার পিতা দুইটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিলেন; একটী চিকিৎসকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "এই মুদ্রাদ্বয় আগন্তুকের নিকটেই ছিল। একটা আপনাকে দিলাম, অপরটী ইহার পথ্য ও আমাদের ভরণ পোষণের জন্য রাখিলাম। চিকিৎসক সন্তুষ্ট হইলেন। রোগীকে দেখিয়াই ভিষক্‌বর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইনি অবশ্য কোন মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারিলে, পশ্চাৎ যে বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন, এরূপ আশাও তাঁহার জন্মিয়াছিল। ভিষক্‌বর ঔষধাদি প্রদান করিয়া এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অহল্যার পিতা পুনরায় চিকিৎসকের পশ্চাদনুসরণ

করিলেন। ভিষক্‌বর পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, অহল্যার পিতা আসিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তুমি আর আসিতেছ কেন"? অহল্যার পিতা বলিলেন, "মহাশয়! এই দুর্ভিক্ষের দিনে আমার ন্যায় ইতর ও দরিদ্র ব্যক্তি বাজারে স্বর্ণমুদ্রা বিনিময় করিতে গেলেই শান্তিরক্ষক তস্কর ভাবিয়া ধৃত করিবে। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া মুদ্রাটী ভাঙ্গাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হই"। চিকিৎসকের নিকটেই বিনিময়োপযুক্ত রৌপ্য মুদ্রা ছিল, তিনি যথাযোগ্য টাকা প্রদান করিয়া স্বর্ণ মুদ্রাটী গ্রহণ করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অহল্যার পিতা আপনাদের জন্য অতি সামান্য আহারীয় দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অহল্যার পিতা রোগীর নিকট যাইয়া বসিলেন, অহল্যার মাতা রন্ধনাদি করিতে লাগিলেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু রোগীর পীড়া উপশম হইতেছে না। চিকিৎসক প্রতিদিন আসিয়া দেখিতেছেন; ক্রমে অষ্টাহ গত হইল। রোগীর মুখশ্রী দিন দিন পাংশুবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। দ্বাদশ দিনে জ্বর হ্রাস প্রাপ্ত হইল। পরদিন আর জ্বর হইল না। ইহার দুই তিন দিনের পরই রোগী অনেকটা সুস্থ হইলেন, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা গেল না। অহল্যার পিতা মাতা প্রাণপণে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন। আর ও সাত আট দিন পরে আগন্তুক অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, অহল্যার পিতাকে বলিলেন "প্রিয় বন্ধু! অদ্য রজনী-যোগে আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিব। তোমার দয়াতেই

আমি জীবন লাভ করিয়াছি। নিতান্ত পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ না হইলে, এত উপকার মানুষ কখনও বিস্মৃত হয় না”।

অহল্যার পিতা বলিলেন “বন্ধুবর! আমি সপরিবারে অনাহারে মারা যাইতে ছিলাম, তোমার অর্থেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়াছে।

আগন্তুক সহাস্যে বলিলেন “বন্ধু! কে কাহার কাছে অধিক কৃতজ্ঞ, সে মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই। ভাই! তোমার ন্যায় অকপট সুহৃদের কাছে আমি কোন কথাই গোপন করিব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তোমরা আমার পরিচয় পাইলে অধিকতর আহ্লাদিত হইবে। ভাই! আমার নাম বাদসাহ হুমায়ুন।”

অহল্যার পিতা মাতা শিহরিয়া একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ হাস্যমুখে উভয়ের হস্তধারণ করিয়া উপবেশন করাইলেন। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন “ভাই! আমি সংপ্রতি বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হইয়াছি। বিশ্বাসঘাতকেরা কেবল আমার সিংহাসন অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, যথা শক্তি আমার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিয়াছিল। আমি গোপনে পলায়ন করিলাম। জানি না, কি সূত্রে বিদ্রোহীগণ পলায়ন সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আমার পশ্চাদনুসরণ করিল। আমার মৃত অশ্বটী অত্যন্ত দ্রুতগামী ও তেজস্বী ছিল, আহা! তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। আমি প্রাণভয়ে অশ্ব অতি দ্রুতবেগে চালাইয়া অবশেষে সিন্ধুগর্ত্তে পতিত হই। তৎপরের ঘটনা তুমি সমস্ত জ্ঞাত আছ।”

অহল্যার পিতা যুক্ত করে বলিলেন "সাহেন সা! না জানিয়া এ নরাধম শত শত গুরুতর অপরাধ করিয়াছে" এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। বাদসাহ অহল্যার পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই! যদি কখনও পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তোমাদিগকে সুখী করাই আমার প্রথম কার্য্য হইবে। ভাই! তোমার দুহিতা অহল্যার ন্যায় সুন্দরী বালিকা ইহ জীবনে আমি আর দেখি নাই। অহল্যা যেমন রূপবতী, সেইরূপ গুণবতী ও বিদ্যাবতী হউক, ইহা আমার বাসনা। ভাই, তুমি অহল্যাকে লেখা পড়া শিখাইও। বন্ধো! আমার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ যাহা আছে, তাহা হইতে চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তোমাকে প্রদান করিলাম। আর এই অঙ্গুরীটী (বলিতে বলিতে বাম হস্তের অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া অহল্যার পিতার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন)— তোমাকে স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ দিলাম। এই অঙ্গুরীটী কাবুলের বাদসাহ আমার কনিষ্ঠ সহোদর কামরণ আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। অঙ্গুরীটী মূল্যবান, মণিকারগণ ইহার মূল্য দ্বিলক্ষ মুদ্রা অবধারণ করিয়াছেন। ঈশ্বর না করুন, বিশেষ অভাবে পড়িলেও এই অঙ্গুরীটী বিক্রয় করিও না। ভাই! আমি অদ্য পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিব। পারস্যের সাহ আমার পরমাত্মীয়। তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমি বিদ্রোহী দমনের চেষ্টা করিব। যদি কৃতকার্য্য হই, যদি দিল্লীর সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হই, তবে ভাই তুমি অবশ্য অবশ্য সপরিবারে দিল্লী যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

অহল্যার পিতা বলিলেন, "নরনাথ! আপনার দান শিরোধার্য্য। কিন্তু আমি দরিদ্র হড্ডিক, আমি এত অর্থ নিয়া কি করিব? বাদসাহের এই সময়ে যুদ্ধাদি কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন হইবে। ধর্ম্মাবতার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াও ত এ দাসানুদাসকে পুরস্কৃত করিতে পারিবেন?"

বাদসাহ হুমায়ুন বলিলেন, ভ্রাতঃ! এই সামান্য অর্থ দ্বারা যুদ্ধের বিশেষ আনুকূল্য হইবে না। আমি পাথেয় স্বরূপে ইহা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। দ্বি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারস্যে পঁহুছিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহা আমি তোমাকে দেই নাই। ভাই! অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করিও না—করিলে আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইব। বন্ধুবর! তোমাকে আমার আরও একটী উপকার করিতে হইবে। আমি বাহন হীন, আমাকে একটী অশ্ব, তদভাবে একটী উষ্ট্র ক্রয় করিয়া দিতে হইবে। অন্যথা পদব্রজে পথ চলিতে সমর্থ হইব না।

অহল্যার পিতা বলিলেন "নরনাথ! এখানে অশ্ব পাইবার সম্ভাবনা নাই, আমার জনৈক প্রতিবেশীর একটী উষ্ট্র আছে। সে তাহা বিক্রয় করিতেও ইচ্ছুক। ক্রেতা অভাবে বিক্রয় করিতে পারে নাই। অনুমতি হইলে সেইটী আনিতে পারি।" বাদসাহ আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। অহল্যার পিতা অবিলম্বে উষ্ট্র স্বামীর সমীপে যাইয়া যথোপযুক্ত মূল্যে তাহা ক্রয় করিলেন।

পাঠক! এই উষ্ট্র বিক্রেতাই পার্ব্বতীর দ্বিতীয় স্বামী।

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। সন্ধ্যা

সমাগত হইল। চন্দ্রদেব সহস্র সহস্র নক্ষত্র সহ আকাশে প্রকাশিত হইলেন। বাদসাহ চিকিৎসকের জন্য এক শত সুবর্ণ মুদ্রা অহল্যার পিতার হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অহল্যার মাতার নিকটেও বিদায় গ্রহণ করিয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে উষ্ট্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। অহল্যার পিতা মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলেন।

অহল্যার পিতা ইতর জাতি হইলেও বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি বাদসাহ প্রদত্ত অর্থে নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই প্রদেশে অহল্যার পিতা এক্ষণে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি হইলেও, নীচ জাতি বলিয়া কোন ভদ্র লোক প্রায় তাঁহার আলয়ে আসিতেন না। ম্লেচ্ছক জাতির ছায়া স্পর্শেও আর্য্যদের জাতি নাশ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নৌকা মেলি যায় সাধু বেণের নন্দন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

চৈত্র মাস, অতি প্রবল গ্রীষ্ম। মার্ত্তণ্ড দেবের প্রখর কিরণে ভূমণ্ডল যেন ঝলসিয়া যাইতেছে, বায়ু অভাবে বৃক্ষের একটী পত্রও নড়িতেছে না। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু গ্রীষ্মের প্রখরতা পূর্ব্ববৎ রহিল। অহল্যা ও তাহার পিতা মাতা তালবৃন্ত হস্তে অট্টালিকার ছাদে যাইয়া উপবেশন করিলেন। সিন্ধুনদ গম্ভীরভাবে মৃদু মন্দ হিল্লোলে বহিয়া যাইতেছে, শত শত তরণী তাহার বক্ষোপরি ভাসিয়া ভাসিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। আকাশের এবং নদের উভয় তটের বৃক্ষ, গৃহ, মন্দির প্রভৃতির ছায়া বিপরীত ভাবে জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত ও হিল্লো-লাঘাতে ঈষৎ দুলিতেছিল। অহল্যা এক মনে বিমুগ্ধ ভাবে প্রকৃতির এই মহান্ দৃশ্য অবলোকন করিতেছে। আলুলায়িত কেশদাম ও কপোলে মুক্তার ন্যায় স্বেদ বিন্দু সেই বিশ্ববিমো-হিনীকে অধিকতর সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। এক খানি

অতি সুদৃশ্য বৃহৎ তরণী দূরে তাঁহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল। অহল্যা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা! এমন বড় ও সুন্দর নৌকা ত এ পথে কখনও যাইতে দেখি নাই।"

অহল্যার পিতা বলিলেন, "মা! তুমি দেখিবে কি, এমন সুন্দর ও বৃহৎ নৌকা আমরাও জীবনে কখন দেখি নাই। বোধ করি, কোন সম্রাট বা রাজাধিরাজ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দেখিতেছ না? ঐ বৃহৎ তরণীর অগ্রে ও পশ্চাতে বামে ও দক্ষিণে যে সমস্ত নৌকা যাইতেছে, সকল গুলির পতাকাই একাকার ও একই চিহ্ন বিশিষ্ট। প্রতি তরণীর অগ্রদেশেই সশস্ত্র সৈন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"

ধীরে ধীরে সেই তরণী শ্রেণী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহারা অধিকতর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। সেই সুদৃশ্য তরণীর অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ স্বর্ণ-বিমণ্ডিত। মস্তকে লাল পাগড়ী, পরিধানে পীতবর্ণের পা-জামা, অঙ্গে পীতবর্ণের অঙ্গরাখা, দ্বাত্রিংশ জন তরণী বাহক রূপার পাতে মোড়া ক্ষেপণী সকল দুই হস্তে ধরিয়া একবার জলে ফেলিতেছে ও উঠাইতেছে; অস্ত গমনোন্মুখ-সূর্য্য-কিরণে সিন্ধু-জলে সেই ক্ষেপণীগুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। অহল্যা এই নৌকার বহর দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিতা,—ইদানীং তাহার এমন হর্ষভাব আর দেখা যায় নাই। তাহার পিতা মাতা বহু দিন পরে দুহিতার প্রফুল্ল বদন দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলেন।

দেখিতে দেখিতে জগৎ-লোচন দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। তরণী শ্রেণীও ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

তাঁহারাও সৌধশির হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া অট্টালিকার মধ্যের কক্ষে যাইয়া উপবেশন করিলেন। এই কক্ষটীর কোন নির্দ্দিষ্ট নাম দিতে হইলে, ইহাকে অন্দর মহলের বৈঠকখানা বলাই সঙ্গত। কক্ষটী সুসজ্জিত। কয়েক খানি তক্তপোশের উপরে এক খানি বৃহৎ গালিচা পাতা; তদুপরি সাত আটটী ছোট বড় তাকিয়া। চতুর্দ্দিকের দ্বারের উপরে দেয়ালের গায় সুদৃশ্য ছবি টাঙ্গান রহিয়াছে! তন্নিম্নে উভয় দ্বারের মধ্যস্থলে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি। কড়ি কাঠের সঙ্গে চারি কোণে চারিটী ও মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটী ঝাড় লম্বিত। একটী পিত্তল নির্ম্মিত দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। অহল্যা ও তাহার পিতা মাতা সেই তরণী শ্রেণীর ও অন্যান্য নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন অহল্যা আজি সকল কথাই হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে। আজি পর্য্যন্তও সে তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত পিতা মাতাকে বলে নাই। বালিকা সর্ব্বদাই মনে মনে স্বপ্নের কথা ভাবিত—ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়িত। পিতা মাতার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সহসা সেই স্বপ্ন-কাহিনী তাহার মনে পড়িল; ক্ষণ কাল মনে মনে আন্দোলন করিয়া আজি পিতা মাতার সমীপে আনুপূর্ব্বিক স্বপ্ন বিবরণ বলিল।

অহল্যার পিতা মাতা শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।
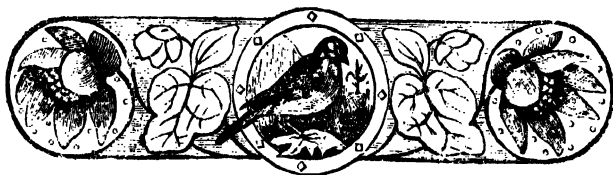
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—ইন্দুবালা গাঁথে ফুল;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল॥
কুরঙ্গী যেমন, শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব;
সেইরূপ ভয়ে, চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়
ফুলমালা হাতে, ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অহল্যা। দিদি! আজ ব্যথাটা কেমন?

ফাতেমা। আজ অনেকটা কম বোধ হইতেছে। অহল্যা, তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবল আমারই সেবা শুশ্রূষা করিতেছ, যাহাতে আমার কোন ক্লেশ না হয়, তোমার পিতা মাতা প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতেছেন। এ হতভাগিনীকে বাঁচাইবার জন্য তোমরা কেন এত যত্ন করিতেছ?

অহল্যা। দিদি! তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? ভগবান্ তোমার হৃদয়েশ্বরকে অবশ্যই জীবিত রাখিয়াছেন, যথা সাধ্য অনুসন্ধান না করিয়া একেবারে চরম সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে।

ফাতেমা। অহল্যা! এই কয়েক দিনেই তোমাকে সহোদরার ন্যায় ভালবাসিয়াছি, আমার যদি কনিষ্ঠা সহোদরা থাকিত, আমি তাহাকে তোমার অধিক ভালবাসিতে পারিতাম না। ভগিনি! তোমাকে বলিতে কি, যদি শীঘ্র তাঁহার কোন অনুসন্ধান না পাই, তবে এ প্রাণ রাখিব না।

অহল্যা। কাল্ বাবা বলিলেন যে, বাহাদুর খাঁ জীবিত থাকিলে মুলতানে না যাইয়া সম্ভবতঃ দিল্লীতেই যাইবেন। তোমাকে লইয়া আমরা সকলেই দিল্লী যাত্রা করিব। বাবা আরও বলিলেন যে, বাহাদুর খাঁ জীবিত থাকিলে, তিনি দিল্লীতে যান আর না-ই যান, বাদসা হুমায়ুন আর তোমার পিতার চেষ্টায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবেই। বাবা দ্রুতগামী নৌকায় যে সকল লোক তোমাদের নৌকার সন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই ফিরিয়া আসিয়াছে। যে স্থানে জলদস্যুগণ তোমাদের নৌকা আক্রমণ করে, সে স্থান হইতেও লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা কোন সন্ধানই করিতে পারে নাই। আর একদল সন্ধানকারী তিন চারি দিনের মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

ফাতেমা। যখন দস্যু হস্তে আমাদের সৈন্যগণ প্রায় বিনষ্ট হইল, তখন আর উদ্ধারের ভরসা নাই ভাবিয়া, তিনি একটা

বড় তাকিয়ার উপরে আমাকে বান্ধিয়া জলে ভাসাইয়া দেন। তিনি জীবিত থাকিলে আমার সন্ধানে এই দিকেই আসিতেন। নদের উজান দিকে গমন করা সম্ভবপর নয়।

অহল্যার ভবনে এই বিষাদিনী সুন্দরী কে? পাঠক ইহার পরিচয় জ্ঞাত হইতে কৌতূহল জন্মিয়াছে কি? ইনি বাদসাহ হুমায়ুনের সুবিখ্যাত সেনাপতি মহানুভব বৈরাম খাঁর দুহিতা। পারস্য রাজের প্রধান মন্ত্রীর পুত্র বাহাদুর খাঁর সহিত ইনি পরিণীতা হইয়াছেন। বাদসাহ হুমায়ুন বাহাদুর খাঁকে মুলতানের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিয়া অবিলম্বে তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত অহল্যা যে তরণী দেখিয়াছিলেন, সেই সুদৃশ্য বৃহৎ তরণীতে বাহাদুর খাঁই মুলতানে যাত্রা করিয়াছিলেন। যে দিন সেই নৌকা সকল করাচী গ্রাম অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার দুই দিন পরে অন্ধকার রজনীতে প্রায় পঞ্চ সহস্র জলদস্যু ইহাদের বহর আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধের পরে দস্যুগণ জয়লাভ করে। দস্যু হস্তে আর পরিত্রাণের উপায় নাই ভাবিয়া, অপমান আশঙ্কায় বাহাদুর খাঁ প্রাণসমা বিবি ফাতেমাকে সেই ঘোরান্ধকার মধ্যে জলে ভাসাইয়া দেন। জলে ভাসিতে ভাসিতে অচৈতন্যাবস্থায় বিবি ফাতেমা করাচী গ্রামের কিঞ্চিৎ উজানে সিন্ধুনদের একটী চরে ঠেকিয়া আবদ্ধ রহেন। পরদিন প্রভাত কালে ধীবরগণ তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া তীরে উত্তোলন করে। ধীবরগণ বিবি ফাতেমার অলৌকিক রূপরাশি এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বহু মূল্যবান অলঙ্কার ও সুবর্ণ খচিত নানাবিধ

কারুকার্য্য বিশিষ্ট পরিচ্ছদ দেখিয়া কোন ধনাঢ্য লোকের বনিতা ভাবিয়াছিল। তাহারা অনেক চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যবন্ত অহল্যার পিতাকে সকল কথা জানাইবার জন্য দলস্থ জনৈক মৎস্যজীবীকে পাঠাইয়া দেয়। অহল্যার পিতা সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যানাদি সহ স্বয়ং আগমন করিয়া বিবি ফাতেমাকে নিজালয়ে লইয়া যান। চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় এবং তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার জ্ঞানোদয় হয়। অপরাহ্নে অপেক্ষাকৃত সবলা হইয়া তাঁহার শোচনীয় অবস্থার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিলে, অহল্যার পিতা বাহাদুর খাঁর সন্ধানে নানা স্থানে লোক প্রেরণ করেন। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবি ফাতেমার অত্যন্ত জ্বর এবং বক্ষ-স্থলে দারুণ ব্যথা হয়। দুই দিন হইল জ্বর আরোগ্য হইয়াছে। ব্যথাটাও অনেক কমিয়াছে, এ সংবাদ ফাতেমা বিবির মুখেই পাঠক শ্রবণ করিয়াছেন।

অহল্যা নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া বিবি ফাতেমাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইল। অহল্যা একটা পানের খিলি লইয়া বিবি ফাতেমার মুখে দিতে যাইতেছেন, এমত সময় অহল্যার পিতা দ্রুতগতি সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন, "বাহাদুর খাঁর সংবাদ লইয়া লোক আসিয়াছে, তিনি অল্পক্ষণ পরেই এখানে আসিয়া পৌছিবেন।" শ্রবণ মাত্র বিবি ফাতেমা সহসা দণ্ডায়-মান হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় শয্যায় পতিত হইলেন।

হঠাৎ সংবাদ জানাইয়া কর্ম্মটা ভাল করি নাই বলিয়া, অহল্যার পিতা ফাতেমার মস্তকে চক্ষে শীতল জল দিতে লাগি-

লেন। ক্ষণ পরে ফাতেমার জ্ঞানোদয় হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?" অহল্যার পিতা বলিলেন,—"তিনি যানারোহণে আসিতেছেন। প্রত্যাগত লোকের মুখে শ্রবণ করিলাম, তিনি নিতান্ত অবসন্নাবস্থায় সিন্ধুর তীরে পড়িয়াছিলেন, আমার প্রেরিত লোকে তাঁহার সন্ধান পায়, এবং যান ও বাহক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেছে। সংবাদ দাতা এই শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য অশ্বারোহণে অগ্রেই আসিয়াছে।"

অহল্যার পিতা এই কথা বলিয়াই বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বাহাদুর খাঁর অভ্যর্থনার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই দণ্ড অতীত হইয়া গেল। বিবি ফাতেমার নিকট এই দুই দণ্ড অতি দীর্ঘ সময় বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। অহল্যা বিবি ফাতেমাকে লইয়া অট্টালিকার ছাদে উঠিবার জন্য সোপানারোহণ করিতে লাগিলেন, ফাতেমার শরীর একে দুর্ব্বল ছিল, এই শুভ সংবাদ পাইয়া যেন অধিকতর দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলেন। তিনি সোপানাবলী অতিক্রম করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। অহল্যা ও পার্ব্বতী উভয়ে তাঁহার উভয় বাহু ধরিয়া ধীরে ধীরে সৌধশিরে আরোহণ করাইল।

সকলেরই দৃষ্টি রাজপথের দিকে; এমন সময়ে দূরে একখানি শিবিকা আসিতেছে দেখা গেল। বাটীস্থ সকলে মহানন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। অহল্যার পিতা বহু লোক

সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আলয়ে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। চোপদারগণ মুহুর্মুহু বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। গ্রামস্থ স্ত্রীলোকগণ আনন্দে হুলুধ্বনি দিল। অনতি বিলম্বে শিবিকা আসিয়া প্রাঙ্গনে পৌঁছিল। অহল্যার পিতা, বাহাদুর খাঁকে সঙ্গে লইয়া একেবারে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। অহল্যা বিবি ফাতেমাকে পূর্ব্বেই ছাদ হইতে অবতরণ করাইয়া অট্টালিকার মধ্যের কক্ষে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। অহল্যার পিতা বাহাদুর খাঁকে সেই কক্ষ দেখাইয়া দিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ অভাবনীয় এবং শোচনীয় বিচ্ছেদান্তে অপূর্ব্ব মিলন যথাযথ চিত্রিত করিতে এ দুর্ব্বল হস্ত অক্ষম। বিশেষতঃ মুসলমান আমীরদিগের অন্তঃপুরে চন্দ্র সূর্য্যেরও প্রবেশাধিকার নাই, গ্রন্থকার কিরূপে তাহা দেখিবেন ও বর্ণনা করিবেন, তাই এই পরিচ্ছেদের এই খানেই পরিসমাপ্তি হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই,
তবু হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।
শীতের ওড়াণি পিয়া গীরিষের বা,
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

বিদ্যাপতি।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

সুখ অথবা দুঃখ স্থায়ী নহে বলিয়াই ভূমণ্ডলে মানবজাতি —কেবল মানবজাতি কেন,—সমস্ত প্রাণী জগত জীবিত রহিয়াছে। মানব! যদি তুমি কেবল সুখের ক্রোড়ে লালিত হও, জীবনে কখন অভাব, কি কোন প্রকার দুঃখ ভোগ না কর, তাহা হইলেই কি তুমি সুখী? কখন না। তিক্ত দ্রব্যের আস্বাদন না জানিলে মিষ্ট ও তিক্তের প্রভেদ বুঝিবে কেমন করিয়া? অমানিশা না থাকিলে পূর্ণিমার যামিনী এত নয়নানন্দদায়িনী হইত কি?

যে দিন দস্যু হস্তে ধন, মান, যশঃ—এমন কি, প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে পর্য্যন্ত হারাইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে বাহাদুর খাঁ সিন্ধুর

তটে পতিত ছিলেন, সেই দিন তিনি কি ভাবিয়াছিলেন? ভাবিয়াছিলেন, এ জগতে তাঁহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে? আর যে দিন অহল্যার ভবনে হৃদয়েশ্বরী বিবি ফাতেমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নীরবে নয়ন যুগল হইতে অশ্রু-বারি মোচন করিতেছিলেন, সে দিন সেই সময়ে বাহাদুর খাঁ মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিয়াছিলেন, এ জগতে তাঁহার ন্যায় আর সুখী কে?

অহল্যার পিতার ভবনে সেনাপতি বৈরাম খাঁর জামাতা মুলতানের নব শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ জনরবের সহস্র রসনায় করাটী গ্রামের চতুর্দ্দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। বাহাদুর খাঁর সঙ্গীয় হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ, ভৃত্যবর্গ ও তরণীবাহক প্রভৃতিও এই সংবাদ অবগত হইয়া ক্রমে ক্রমে অহল্যার পিতার ভবনে আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক শত হইবে। সেই শত সংখ্যকের মধ্যে এক জনের শরীরও অক্ষত নহে। সহৃদয় বাহাদুর খাঁ ইহাদের দুরবস্থা দর্শন করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন।

মুলতানে সে সময়ে ধীরে ধীরে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। বাদসাহ হুমায়ুন কর্ত্তৃক বিদ্রোহ দমন জন্যই বাহাদুর খাঁ শাসনকর্ত্তার পদে বরিত হইয়াছিলেন। বীর-তনয়া বিবি ফাতেমা জেদ্ ও আব্দার করিয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ বিবি ফাতেমাকে আর পঞ্জাব প্রদেশে রাখা

কর্ত্তব্য মনে করিলেন না, তাঁহাকে তাঁহার পিতৃ-ভবনে প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। বিদ্রোহীদিগকে দমন করা আশু কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ অপমানের প্রতিশোধ না লইলেই নয় ভাবিয়া প্রথমতঃ তিনি দিল্লী যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু বিবি ফাতেমা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল্লী যাইতে সম্মতা হইলেন না, অগত্যা বাহাদুর খাঁও সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন।

দিল্লী যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। বাহাদুর খাঁ অহল্যার পিতার নিকটে লক্ষ মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিয়া সৈন্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। অহল্যা এবং তাঁহার পিতা মাতা ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে দিল্লী যাইবেন স্থিরীকৃত হইল। দিল্লী নগরীতে বাহাদুর খাঁর একটী উৎকৃষ্ট বাগান বাটী ছিল, ফাতেমা বিবিকে বিবাহ করিবার সময়ে তিনি তাহা যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাহাদুর খাঁ অহল্যার পিতাকে দিল্লী যাইয়া তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন, অহল্যার পিতা আহ্লাদের সহিত এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

অহল্যার পিতা দুইজন কর্ম্মচারী, আট জন ভৃত্য ও আট জন শরীর রক্ষক এবং পার্ব্বতীকে সমভিব্যাহারে লইবেন, এইরূপ ধার্য্য হইল।

অহল্যার পিতা, তদীয় বনিতা এবং দুহিতাকে তাঁহাদের কুটীরে বাদসাহ হুমায়ুনের বিপন্নাবস্থায় আগমনের ঘটনা কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পূর্ব্বেই নিবারণ করিয়াছিলেন। অহল্যার পিতা নিরক্ষর ইতর জাতি হইলেও রহস্য গোপনে ক্ষমবান ছিলেন।

যদিও এ রহস্য ভেদে বাদসাহের বিশেষ কোন ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, বরং বাদসাহের প্রাণ রক্ষাকারী বলিয়া বাহাদুর খাঁর সমীপে অধিকতর আদরণীয় ও সম্ভ্রমের পাত্র হইতেন, তথাপি বাদসাহের দুরবস্থার কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করা তিনি সঙ্গত মনে করিতেন না।

বিবি ফাতেমার সহিত অহল্যার সম্প্রীতি দিন দিন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অহল্যাকে ক্ষণকাল না দেখিলেই, বিবি ফাতেমা ক্লেশানুভব করিতেন। অহল্যা অসঙ্কুচিত চিত্তে বাহাদুর খাঁর সহিত নানা প্রকার কথোপকথন ও রহস্যাদি করিতেন। অহল্যা বিদ্যাবতী এবং সুরসিকা, বিশেষতঃ মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস। বাহাদুর খাঁ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা?
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে.
না শুনে কাহার কথা।

চণ্ডীদাস।

সপ্তাহ হইল, অহল্যা ও তাঁহার পিতা মাতা দিল্লী নগরে বাহাদুর খাঁর উদ্যান বাটিকায় অবস্থান করিতেছেন। এই উদ্যান ভবন বাদসাহ হুমায়ূনের প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে এক ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। উদ্যানের চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। মধ্যস্থলে সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার দুই পার্শ্বে দুইটী অনতি বৃহৎ জলাশয়, পশ্চাতে রন্ধন-শালা ও ভৃত্যাদিগের বাস-গৃহ। তৎপশ্চাতে নানা জাতীয় সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ সমূহ। বৃক্ষগুলি শ্রেণিবদ্ধ। উদ্যানের সম্মুখস্থ ফটক অতি বৃহৎ। ফটকের উভয় দিকে দ্বারবানদিগের বাসের জন্য চারিটী ক্ষুদ্র ইষ্টক-গৃহ। উদ্যানের নাম "দেলখোস।" ফটকের শীর্ষদেশে বৃহৎ পার্সি অক্ষরে "দেলখোস" লিখিত রহিয়াছে।

অগাধ জলে সফরী যেরূপ শান্তিলাভ করে না, অহল্যার পিতাও দিল্লী নগরে আসিয়া সেইরূপ শান্তিলাভ করিতে সক্ষম

হইতেছেন না। তিনি আমীর-জন-ভোগ্য উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যে বাস করিতেছেন, ভৃত্যগণ অবনত মস্তকে সর্ব্বদা আজ্ঞা পালন করিতেছে; বৈরাম খাঁ, বাহাদুর খাঁ প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর আমীরগণ তাঁহার বাস-ভবনে প্রতিদিন গমনাগমন করিতেছেন, বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মনে শান্তি নাই কেন? করাটী গ্রামে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য, দিল্লীর জন-সমুদ্রে তিনি গণ্ডূষ জল মাত্র নগণ্য, এই ভাবিয়াই কি তিনি হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না? এখানে প্রতিপদে আঘাত পাইয়া তাঁহাকে আদব কায়দা শিখিতে হইতেছে; সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট বসন, বাহন, যানাদি ব্যবহার করিতে হইতেছে; আমীরের ন্যায় চাল-চলনে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতেছে; সেই জন্যই কি তাঁহার হৃদয় অশান্তি-পূর্ণ? হইতে পারে। কিন্তু অহল্যার ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। কারারুদ্ধ ব্যক্তির কোন অভাবনীয় কারণে হঠাৎ কারামোচন হইলে, তাহার হৃদয়ে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, অহল্যা ততোধিক আহ্লাদিতা। অহল্যার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না।

অহল্যার পিতা অট্টালিকার একটী দ্বিতল কক্ষে বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আর এক এক বার পথের দিকে তাকাইয়া যেন কি দেখিতেছেন; এমন সময়ে অহল্যার মাতা সেই কক্ষে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বেলা হলো, অহল্যা এখনও যে এলো না? আজ সকালে আসিবে ব'লে গিয়েছিল।"

অহল্যার পিতা বলিলেন "বোধ করি বিবি ফাতেমা ছেড়ে দেন্ নাই।"

অহল্যা পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্ণে বিবি ফাতেমার আহ্বানে তাঁহার ভবনে গমন করিয়াছিল।

অহল্যার মাতা পথের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "ঐ বুঝি আসিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে প্রহরি বেষ্টিত একখানি শিবিকা উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। অহল্যা শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

অহল্যার পিতা অহল্যাকে দেখিয়া বলিলেন "মা এ স্থানের আদব কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়; এখন তুমি বয়স্থা হইয়াছ, এখন কি আর অপরিচিত লোকের সম্মুখে বিনাবগুণ্ঠনে শিবিকা হইতে অবতরণ করা কর্ত্তব্য? তা'রা কি মনে কর্ব্বে? ছি, মা! একটু বুঝে সুঝে চ'লো।"

অহল্যা পিতার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কক্ষান্তরে গেল। মনে মনে ভাবিল, অবিবাহিতার অবগুণ্ঠন কেন? অবগুণ্ঠন বিবাহিতাদের জন্য।

অহল্যার পিতা বাহাদুর খাঁর দ্বারবান এবং শিবিকা-বাহক-দিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। তাহারা হৃষ্ট মনে প্রস্থান করিল।

অহল্যা স্বীয় কক্ষে গমন করিয়া একখানি ওড়না দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিল; বসন ভূষণ কিছুই পরিত্যাগ করিল না।

অহল্যার মাতা তাহাকে শয়ন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন শু'য়ে যে? স্নানাহার করিবে না?"

অহল্যা মৃদুস্বরে বলিল "মা! আমার বড় মাথা ধরেছে, শীত ও করিতেছে, আমি একটু শুয়ে থাকি। তোমরা খাও দাওগে, আমি আজ খাইব না।"

অহল্যার মাতা "অসুখ হ'লে আজ আর খেয়ে কাজ নাই" বলিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

অহল্যার শরীর ত বেশ্ আছে, তবে অসময়ে শয়ন করিল কেন? ভাবুক পাঠক! তুমি কিরূপ বিবেচনা কর? অহল্যার পীড়া শারীরিক না মানসিক, কিছু বুঝিতে পরিতেছ কি? পীড়ার কথাটা গ্রন্থকার বড় বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেছেন না।

দিল্লী আসিয়া যে অহল্যা আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল, সর্ব্বদা ফুল্লবদন, সর্ব্বদা হাসি খুসি, আজ তার সহসা এরূপ বিপরীত ভাব কেন? আবার ওকি,—সজোরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল কেন? পাঠক, দেখ দেখ! বিষাদিনীর নেত্রের কোণে মুক্তার ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতেছে। ঐ দেখ, অশ্রু বিন্দু আবরণ ভেদ করিয়া গণ্ডস্থলে পতিত হইল! ওকি অহল্যা! উপাধান মধ্যে মুখ লুকাইতেছ কেন? কক্ষে ত কেহই নাই। অহল্যে! বুঝিয়াছি; প্রস্ফুটিত কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে! পীড়ার ভান করিয়া বাহ্যিক লক্ষণ লুকাইতে পারিবে কি?

অহল্যার অসুখের কথা শুনিয়া রন্ধন শালা হইতে পার্ব্বতী তাহাকে দেখিতে আসিল। পার্ব্বতী অহল্যার শরীরে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল "না জ্বর হয় নি, শরীর বেশ আছে।"

অহল্যা। আমার জ্বর হয়েচে, তোমাকে কে বল্লে?

পার্ব্বতী। মা ঠাকরুণের কাছে শুনিলাম।

অহল্যা। তুমি আমাকে বিরক্ত করিওনা। আমার জ্বর হয় নি, শুধু মাথা ধরেচে। আমাকে বকিওনা, তুমি রান্না ঘরে যাও। একটু ঘুমুলেই সেরে যাবে।

পার্ব্বতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া রন্ধন-শালা অভিমুখে প্রস্থান করিল।

পার্ব্বতী চলিয়া গেলে অহল্যা দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনরায় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—বাজিছে বাজনা,
নাচিছে নর্ত্তকী বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক—

দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতি;
জনস্রোত রাজ পথে বহিছে কল্লোলে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অদ্য রজনীতে সেনাপতি বৈরাম খাঁর ভবনে মহা সমারোহ হইবে। প্রাতঃকাল হইতেই তাহার বিপল আয়োজন হইতেছে। আগামী কল্য প্রভাতে বাহাদুর খাঁ মুলতান যাত্রা করিবেন, সেই জন্যই তদীয় শ্বশুর মহাড়ম্বরে বিপুল ভোজের আয়োজন করিতেছেন। অহল্যার পিতা ও সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এই নিমন্ত্রণে তিনি সুখী হন নাই। নিরক্ষর হড্ডিক আদব-কায়দার কথা ভাবিয়াই অস্থির। বড় বড় আমীর ওমরাহদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহাদের সহিত আলাপ, সম্ভাষণ করিতে হইবে, একটু ত্রুটি হইলেই সর্ব্বনাশ!
উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতাভিমানিগণ! ইতর হড্ডিকের

অবস্থা মনে করিয়া হাসিও না। তোমরা সেই পুণ্যতীর্থ শ্বেতদ্বীপে শ্বেতকায়দিগের অনুকরণ করিতে যাইয়া যখন পদে পদে বিড়ম্বিত হও, তখনকার অবস্থা স্মরণ করিয়া ইতর হড্ডিকের প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ কর।

অহল্যার মাতা পীড়ার ভাণ করিয়া নিমন্ত্রণ ভবনে যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন। অহল্যার পিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন না। বেচারি অহল্যা সামান্য বেশে নিমন্ত্রণ ভবনে যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু পিতার দার্ঢ্য আদেশে মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিতা হইল। বিবি ফাতেমা দিবা-ভাগেই তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তদনুসারে পিতা পুত্রী অপরাহ্নে যথাযোগ্য সমারোহের সহিত সেনাপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যা-সমাগমে সেনাপতির ভবন যেন ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ফটকের ঊর্দ্ধে মনোমুগ্ধকর নহবৎ বাজিতেছে, বহিঃপ্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিক ঘনালোকমালায় বিভাসিত, শ্রেণিবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র সৈন্যগণ দণ্ডায়মান। এক এক জন আমীর শুভাগমন করিতেছেন, অমনি সৈন্যগণ শস্ত্র নত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

পুরীর অভ্যন্তরের শোভা অধিকতর মনোহর। দ্বারে দ্বারে সুরঞ্জিত আসাসোটাধারীগণ দণ্ডায়মান, কক্ষে কক্ষে অসংখ্য রৌপ্য দীপাধারে অসংখ্য সুগন্ধ তৈলযুক্ত দীপাবলী জ্বলিতেছে; স্বর্ণ-সূত্র-সংসাধিত মস্‌লন্দ; তাহার সম্মুখে রৌপ্য ত্রিপদীর

উপরে মণি মুক্তা যুক্ত স্বর্ণের আতর দান, পাণদান, গোলাব-পাস প্রভৃতি সুসজ্জিত রহিয়াছে। ঝার, ফানস, দেয়ালগিরী ও মনোহর বৃহৎ বৃহৎ চিত্র সকলে প্রতি কক্ষ অতুলনীয় শোভাধারণ করিয়াছে। কোন কক্ষে কলাবতগণ ধ্রুবপদ সঙ্গীত করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মেঘ-মন্দ্ররবে মৃদঙ্গ বাদিত হইতেছে, কোন কক্ষে অপ্সরী তুল্যা নর্ত্তকীগণ হাবভাব-যুক্ত নানা প্রকার নৃত্য করিতেছে। পুরীর অভ্যন্তরে যেন আমোদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

সেনাপতি বৈরাম খাঁ নিমন্ত্রিত জনগণের যথোচিত সম্ভাষণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার বদন-মণ্ডল প্রফুল্লতা শূন্য। এই আমোদের তরঙ্গ মধ্যে ও তাঁহার বদনে বিষাদের ছায়া-অঙ্কিত কেন?—এক মাত্র পুত্র জাফর খাঁ পীড়িত। কি পীড়া, চিকিৎসকগণ তাহা ভালরূপে নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। রজনী প্রভাতে পুত্র-তুল্য স্নেহাস্পদ বাহাদুর খাঁ, বিদ্রোহী দমনের জন্য মুলতান যাত্রা করিবেন। কঠোর হৃদয় সেনাপতিও এই সকল ভাবিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণে সে ভাব বড় প্রকাশ পাইতেছে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিয়া নিমন্ত্রিত আমীরদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেছেন।

অহল্যার পিতা, বৈরাম খাঁ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া অন্যতর কক্ষে সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতেছেন। দূরাকাঙ্ক্ষ হড্ডিক এত সমারোহ দর্শনে, এত আমোদ প্রমোদেও

চিত্তে সুখ লাভ করিতে পারিতেছেন না। সেনাপতি ও বাহাদুর খাঁ ব্যতীত অন্যান্য নিমন্ত্রিত আমীরগণ যে তাঁহাকে উপেক্ষার নেত্রে দৃষ্টি করিতেছেন, ইহা বুদ্ধিমান হড্ডিক বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি মনের ক্ষোভ মনেই প্রশমিত করিয়া কোন প্রকারে মৌখিক শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেছেন।

দুরাকাঙ্ক্ষ বৃদ্ধ হড্ডিক! তুমি কি করাটীর সেই পর্ণ-কুটীর এত সহসা বিস্মৃত হইলে? তুমি ইতর হড্ডিক হইয়া ও আজ বাদসাহ হুমায়ুনের প্রধান সেনাপতির ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছ, ইহাই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নহে? অথবা তোমারই বা দোষ কি? মানুষ কুহকিনী আশার ক্রীড়নক মাত্র!

আমোদ আহ্লাদে রাত্রি এক যাম গত হইল। আমীরগণ বিশেষতঃ তাঁহাদের সহচর বৃন্দ আহারে মনোনিবেশ করিলেন। পলান্ন, কোর্ম্মা, কোপ্তা, কালিয়া, কাবাব, নানাবিধ সুমিষ্ট পক্কান্ন, পিষ্টকাদি এবং তৎসঙ্গে পারস্য দেশজাত সিরাজ মদ্যেরও ছড়াছড়ি হইতে লাগিল।

পাঠক! তুমি হিন্দু হইলে, আহারের বর্ণনাটা পাঠ করিও না। এই কুক্কুট বৃষাদির মাংসে লোভ হইলে জাতি রক্ষা করিয়া সমাজে অবস্থান করা সঙ্কট হইবে। গ্রন্থকার ও পিড়িলীর ন্যায় সমাজ চ্যুত হইবার আশঙ্কায় আহারের বর্ণনাটা এই খানেই পরিসমাপ্তি করিলেন।

অভ্যাগতগণ কেহবা স্বভবনে গমন করিতেছেন, কেহবা যাইবেন, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে একজন খোঁজা আসিয়া সেনাপতিকে কর্ত্রীর আহ্বান সংবাদ জানাইল।

নিমন্ত্রিত জনগণের সমীপে বিনয়ের সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া বৈরাম খাঁ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তদীয় পত্নী বিবি করিমন্নেচ্ছা তাঁহার প্রতীক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন, সেনাপতিকে দেখিয়াই বলিলেন যে, জাফর আজ আবার বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

সেনাপতি। অপরাহ্নে ত অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়াছিলাম, সহসা এরূপ বৃদ্ধি হইল কেন?

করিমন্নেছা। ফাতেমা, দাদা দাদা বলিয়া কত ডাকিতেছে, আমিও কতবার ডাকিলাম, উত্তর দিতেছে না। মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বলিতেছে।

সেনাপতি। হেকিমগণ দেখিয়া কি বলিতেছেন?

করিমন্নেছা। তাঁহারা বিশেষ কিছু বলেন নাই। আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইতেছে, জাফর যখন শীকার হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, হেকিমগণ তখন বলিয়াছিলেন যে, তিন চারি দিনেই জ্বর আরোগ্য হইবে। তাহা হইল কৈ?

সেনাপতি। হেকিমগণ অযথা কথা বলেন নাই। ফাতেমা ও বাহাদুর যে দিন দিল্লী আগমন করেন, সেই দিন জাফর রুগ্ন শরীরে পদব্রজে বহিঃপ্রাঙ্গন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল; সেই সমস্ত কারণে পুনরায় বাড়িয়াছে।

করিমন্নেছা। প্রলাপ বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে অহল্যার নাম করিতেছে। অহল্যা অপরাহ্নে এখানে আসিয়াছে, আমি তাহাকে ডাকিয়াছিলাম, সে জাফরের শয়ন-গৃহে আসিয়া লজ্জা-

বশতঃ অধিকক্ষণ রহিল না। আহা, মেয়েটী বড়ই লজ্জা-শীলা। বিধাতা রূপে গুণে অতুল্যা করিয়া অহল্যাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আকার-ইঙ্গিতে যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে ত আমার বিশ্বাস যে জাফর অহল্যাকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছে। অহল্যারও স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতেছি,— তাহার সে প্রফুল্ল ভাব আর নাই। আহা! অহল্যার ন্যায় রূপবতী গুণবতী পুত্র বধূ পাইব, এরূপ শুভাদৃষ্ট কি আমার হইবে?

সেনাপতি। তুমি কি পাগল হইয়াছ? অলহ্যা সুন্দরী এবং গুণবতী বলিয়া কি তাহাকে পুত্র-বধূ করিতে হইবে? সেই হড্ডিক-কুমারী কিংবা তাহার পিতার নিকটে আমরা উপকৃত বলিয়াই কি জাতি, কুল, মান খোয়াইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে? বাদসাহ হুমায়ুনের প্রধান সেনাপতিও দিল্লীর আমীর মণ্ডলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া, অবশেষে কি এক জন নীচ হড্ডিককে বৈবাহিক বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে? স্ব সম্প্রদায়ের নিকটে উচ্চ মস্তক অবনত করিতে হইবে? সেনাপতি বৈরাম খাঁর পুত্র যে একটী নীচ হড্ডিক-বালাকে আত্ম-প্রাণ সমর্পণ করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

ক্রোধে, ঘৃণায়, বিস্ময়ে বৈরাম খাঁর মুখশ্রী গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সেনাপতি আর বাক্যব্যয় না করিয়া পীড়িত জাফর খাঁর কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। বিবি করিমন্নেছাও ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাদানুবর্ত্তিনী হইলেন। ভাল করিতে যাইয়া অশুভ ঘটাইলাম ভাবিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঢাল সুরা স্বর্ণ পাত্রে, ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান,
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ।

নবীন চন্দ্র সেন।

দিল্লীনগরের গড়ের বাহিরে একটী সুদৃশ্য ও প্রশস্ত ইষ্টক-ভবন। বাদসাহ হুমায়ুনের শ্যালক-পুত্র মির্জাগোলাম সেই ভবনে বাস করেন। মির্জাগোলাম দেখিতে সুপুরুষ, কিন্তু অনিয়মিত ইন্দ্রিয় সেবনে দৈহিক লাবণ্য বিশুষ্ক হইয়াছে। নেত্রে বিলাস-কালিমার রেখা পড়িয়াছে। মির্জাগোলাম সুরাপায়ী, লম্পট, পরশ্রীকাতর এবং অহঙ্কারী। বাদসাহের শ্যালক-পুত্র বলিয়া, লোকে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিত না। দিল্লীর প্রসিদ্ধ বদ্মায়েসগণ মির্জার সহচর, তন্মধ্যে দোস্তমহম্মদ ও আমীর আলি অগ্রগণ্য ও প্রিয়পাত্র।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। মির্জাগোলাম কতিপয় সহচর পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদাগারে বসিয়া সুরাপান করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে অপভাষায় হাস্য পরিহাসাদি চলিতেছে। এমন

সময়ে আমীরআলি এক জন দুশ্চারিণী সহ তথায় উপস্থিত হইল। সহচরগণের মধ্য হইতে জনৈক ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া সেই হতভাগিনীর হস্তধারণ করিল এবং মির্জার অতি নিকটে বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে বসাইল।

মির্জাগোলাম সহাস্য বদনে আমীরআলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এটী যে নূতন কুসুম দেখিতেছি ভাই! কোন্ বাগানে ফুটিয়াছিল? কিরূপে সংগ্রহ করিলে?

আমীরআলি। ভাই মধুকর! দিল্লীনগরের প্রায় সমস্ত কুসুমেরইত মধুপান করিয়াছ। যদি বাকি থাকে সে গুলো নগণ্য ভাটী ফুলের মধ্যে। আজ অনেক চেষ্টা করিয়া এই নব কুসুমটী চয়ন করিয়াছি। এ ফুলটি একটী কাঁটা ডালে ফুটিয়াছিল, চয়ন করিবার সময়ে হাত ছড়িয়া গিয়াছে।

মির্জা। দোস্তমহম্মদের সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল? আজ তাহার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

আমীরআলি। না, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

মির্জা। না হয়েছে, বেশ হয়েছে, সে জাহান্নমে যাক্। এখন পরিশ্রম ক'রে এসেছ, একটু আয়েস কর,—এক পেয়ালা টান. এখনি মেজাজ খোস্ হ'য়ে যাবে।

আমীরআলি আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া পাত্রস্থ সুরা উদরসাৎ করিল।

মির্জাগোলাম এক পেয়ালা সুরা সেই দুশ্চারিনীর সম্মুখে রাখিয়া যোড় হস্তে গলবস্ত্র হইয়া রহিল। পাপিয়সী প্রথমে একটু বাহানা করিয়া শেষে তাহা পান করিল।

অশ্লীল অশ্রাব্য সঙ্গীতে, সহচর মাহালদিগের বাহবা, কিয়াবাৎ, জিতারহো প্রভৃতি হৈ চৈ শব্দে কক্ষ পরিপূরিত হইল। এমন সময়ে দোস্তমহম্মদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে বিষম কোলাহলে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দোস্তমহম্মদ মির্জাগোলামের অতি নিকটে যাইয়া বসিল। তাহার মুখশ্রী আজি চিন্তাভারাক্রান্ত। বোধ করি বিশেষ কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নতুবা এই আমোদ-তরঙ্গেও ইয়ারের প্রাণ নাচিতেছে না কেন? দোস্তমহম্মদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মির্জা বলিল,—"কি ভাই দোস্ত! আজ তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

দোস্ত। আর দোস্ত, সেকথা বলিয়া কি হইবে?

মির্জা। আমরা কি এতই পর হইয়া উঠিলাম যে, তোমার একটা কথাও শুনিবার অধিকারী নহি?

দোস্ত। ভাই সেকথা বলিয়া আর তোমাকেও দুঃখিত করি কেন? সেকথা বলিতে গেলে আমার এখনই চ'খের জল বাহির হইয়া পড়িবে।

আমীরআলি। বন্ধুর কাছে সুখের দুঃখের সকল কথাই বলিতে হয়, কিছুই গোপন করা উচিত নহে।

দোস্ত। ভাই, তোমরা ত কেবল মদ খাও আর বণ্ডামি কর, সহরের খবর ত কিছুই রাখনা।

সহচরগণ। কি! কি! খবরটা কি, শুনিইনা হে?

মির্জা। কেন মিছে জ্বালাতন করিতেছ? যাহা বলিবার

থাকে শীঘ্র ব'লে ফেল। না বলিবার হয় বস্ চুপ রহ। সময় মূল্যবান, তোমার জন্য সেই মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করিতে পারিনা।

দোস্ত। ভাই উতলা হইও না। উতলার কর্ম্ম নহে। এই নগরে একটী পরমা সুন্দরী,—এমন কি পরীর অপেক্ষাও সুন্দরী একটী যুবতী আসিয়াছে, তাহার কোন খবর কেহ রাখ কি? তাহার মতন সুন্দরী এ দিল্লী নগরে আর কেহ কখন দেখে নাই।

মির্জা। কেবল তাহাকে দেখিয়াছ মাত্র,—না খবর বার্ত্তা সব ঠিক্ ঠিকানা করিয়াছ?

দোস্ত। খোঁজ খবর সবই লইয়াছি। সহজে প্রাপ্য নহে, বৃহৎ আশ্রয়ে আছে।

মির্জা। আশ্রয় দাতাটা আবার কে? ভেঙ্গেই বল না

দোস্ত। আশ্রয় দাতা স্বয়ং সেনাপতি বৈরাম খাঁ এবং বাহাদুর খাঁ। শুনিয়াছি বাহাদুর খাঁ পঞ্জাব দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছে।

মির্জা। শুনিয়াছি শুনিয়াছি। হা হা হা! একটা হজ্জিকের মেয়ে। সেই কথাইত?

দোস্ত। হাঁ সেই কথাই। বাহাদুর খাঁর উদ্যান বাড়ীতে আমি স্বচক্ষে সেই যুবতীকে দেখিয়াছি। এমন সুন্দরী আর কখনও দেখি নাই—দেখিব এরূপ আশাও নাই।

মির্জা। বটে! প্রাপ্তির পক্ষে কোন সুরাহা করিতে পারিয়াছ কি?

দোস্ত। না সেটা বড় সহজ নহে। উদ্যান, প্রহরী বেষ্টিত। বিশেষতঃ বৈরাম খাঁ, বাহাদুর খাঁ প্রভৃতি সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। শুনিয়াছি বিবি ফাতেমা ঐ যুবতীকে অত্যন্ত ভালবাসেন।

মির্জা। তা'তে কি ব'য়ে গেল। আমি শুনিয়াছি, সেই বুড়া হড্ডিকটা বিবি ফাতেমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল; তাই তাঁহারা সর্ব্বদা গমনাগমন করেন।

দোস্ত। সেই যুবতীও মধ্যে মধ্যে বিবি ফাতেমার আলয়ে যাইয়া থাকে। বিবি ফাতেমার নিজের লোকজন আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়।

মির্জা। তাতে কি আসিয়া যায়। সেত ভালই। অর্থ দ্বারা বিবি ফাতেমার দুই একটা লোককে বশীভূত করিয়া, বিবি ফাতেমা ডাকিয়াছেন এইরূপ ভাবে শিবিকা সহ তথায় যাইতে হইবে। শেষে ফাতেমা বিবির বাড়ীতে অর্থাৎ একেবারে বান্দার গৃহে। সেখানে কার সাধ্য যে সন্ধান লয়।

দোস্ত। বাহবা মির্জাবাহাদুর! তুমি ত বেশ উপায়ের কথা বলিয়াছ। কিয়াবাৎ! কিয়াবাৎ! বলিহারি তোমার বুদ্ধি। সরাব দাও! সরাব দাও! আজি প্রাণ ভরিয়া পান করিব। দেখ ভাই মির্জা! শুভস্য শীঘ্রং। এ শুভ কার্য্যে যেন কাল বিলম্ব না হয়। কালই।

পাঠক! এই নারকীদের চিত্র আর আঁকিতে পারিনা। ইহাদের অসাধ্য কুকার্য্য জগতে কিছুই নাই। হায়! সরলা অহল্যা! অনাগত কালের গর্ভে তোমার পরিণাম ঘোর

তমসাচ্ছন্ন দেখিতেছি। বিধাতা তোমার ন্যায় সুর-সুন্দরী সরলা গুণবতী রমণীকে কি লম্পটের উপভোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? কখনই নহে। তাহা হইলে জগতের এতদিন চিহ্ন মাত্র থাকিত না, রসাতলগামী হইত। যাহা হউক, ভবিষ্যতের ঘটনা ভবিষ্যতের গর্ব্ভে নিহিত। সে যবনিকা উত্তোলন করিয়া, অনাগত-দৃশ্য দর্শন করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। পাঠক! চল, এ নরক-নিবাসে পিশাচ-সহবাসে থাকিয়া আত্মা কলুষিত করিও না।
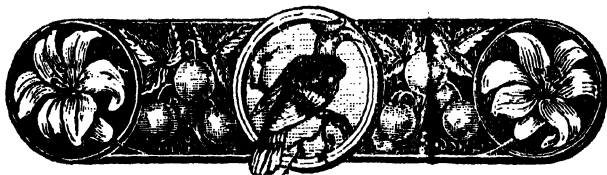
দশম পরিচ্ছেদ

তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী, দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া, গড়িল কোন বা রাজে॥
আহা কিবা সে সুন্দর রূপ!
চাহিতে চাহিতে, পশিলেক চিতে, বড়ই রসের কূপ॥

চণ্ডীদাস।

সেনাপতি বৈরামখাঁর ভবনের পশ্চাতে একটা পুষ্পোদ্যান। তাহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। অন্তঃপুরস্থ মহিলা-দিগের জন্য এই উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। অসুস্থ জাফরখাঁ যষ্টি অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎ-কাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া উদ্যান-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়ের সমীপে মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বদন-মণ্ডল বিষাদ-ঘনাচ্ছন্ন, ললাটে চিন্তা-জনিত কুঞ্চিত রেখা। তিনি ইদানীং বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ি-য়াছেন। বিগত বর্ষে সম্ভ্রান্ত যুবক-শ্রেণীর মল্ল-যুদ্ধ-প্রদর্শনীতে যে জাফরখাঁ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া বাদসাহ হুমায়ুনের প্রসাদ ও স্নেহ-লাভ এবং পিতার আনন্দ বর্দ্ধন ও সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন,

আজ সেই জাফরখাঁর সবল সুদৃঢ় বাহু সামান্য যষ্টির ভার বহনেও অসমর্থ।

শুধু রোগেই কি জাফরখাঁ এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়াছেন? না। তাহা হইলে ললাট চিন্তা রেখায় কুঞ্চিত কেন? বীর-হৃদয় কি মৃত্যু-চিন্তায় অভিভূত হয়? কবি বলিয়াছেন, "চিতা এবং চিন্তা এতদুয়ের মধ্যে চিন্তাই মানবের অধিকতর সর্ব্বনাশকারিণী। চিতা নির্জ্জীবদেহ দগ্ধ করে, চিন্তা সজীবকে তুষানলের ন্যায় ক্রমশঃ ভস্মীভূত করে।" জাফরখাঁ হস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভাবে সেই মর্ম্মর প্রস্তরাসনেই বিষণ্ণ চিত্তে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ও সহোদরা সেই স্থানে আগমন করিলেন। জাফরখাঁ এতই অন্যমনস্ক যে, তাঁহারা অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও জানিতে পারিলেন না। বিবি করিমন্নেছা স্নেহ-বিগলিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাফর! এক মনে ভাবিতেছ কি? শিশির পড়িতেছে, কক্ষে গমন কর। তোমাকে তোমার কক্ষে না দেখিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে এই খানে আসিয়া দেখিলাম।"

জাফর বলিলেন "না, না! কিছুইত ভাবিতেছি না। এই উদ্যানের বৃক্ষগুলি এক মনে দেখিতেছিলাম।"

জাফরখাঁ যে তাঁহার মনের ভাব গোপন করিয়াছেন, বুদ্ধিমতী মাতা তাহা বুঝিতে পারিলেন।

প্রাণাধিক পুত্রের এইরূপ শোচনীয় শারীরিক অবস্থা এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত দেখিয়া মাতার হৃদয়ে যে কি

যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা অপরে কি বুঝিবে? তিনি স্নেহভরে পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন জাফর! প্রাণাধিক পুত্র! কেবল তোমার চন্দ্র মুখ দেখিতে পাই বলিয়াই আমি জীবিত আছি। তুমি যেরূপ তোমার পিতার আকৃতি লাভ করিয়াছ, সেই রূপ তোমার বংশ সম্ভ্রম রক্ষা করিও। যে ব্যক্তি বংশ গৌরব এবং ধর্ম্ম গৌরব রক্ষা করিতে না পারে, সে নরাধম। জাফর! পরমেশ্বর অবশ্যই তোমায় দয়া করিবেন। আমি তাঁহার চরণে তোমার কুশল মাগিয়া লইব। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল. তিনি ধীরে ধীরে পুত্র কন্যা সহ গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! ভগবানের কৃপায় এতদিন সুখেই কাটাইয়াছি, তাঁহার অসীম কৃপায় তোমাকে হারাইয়াও প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যে কি আছে, কিছুই বুঝিতেছি না। বড় আশা করিয়াছিলাম, মা! তোমার একটী সুসন্তান দেখিব, পুত্র-বধূর মুখ দেখিয়া জীবন সার্থক করিব, কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হইল কৈ? আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, জগদীশ্বর আমার সকল মনোসাধই পূর্ণ করিবেন।" পরে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে বলিলেন, "হে দয়াময়! আমার প্রতি বিমুখ হইও না।"

বিবি ফাতেমা মাতার দুঃখে দুঃখিতা ও লজ্জিতা হইয়া অবনত মস্তকে মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, "মা! অহল্যার সঙ্গে কেন দাদার বিয়ে দেওনা? তাঁ'র মত সুন্দরী, নম্রশীলা সুপাত্রী

এই দিল্লীতে কে আছে? আমাদের ধর্ম্মেও অহল্যা বিশ্বাসবতী।”

মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “বাছা! আমি সকলই বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাদিগকে ত এই উদরেই ধারণ করিয়াছি? কিন্তু বাছা! বুঝিলে কি হইবে? হড্ডিককে বৈবাহিক করিতে তোমার পিতা অসম্মত; তাহাতে বংশের অসম্মান হইবে। তিনি উপযুক্ত ঘরে সুপাত্রী অন্বেষণ করিতেছেন। বাবা জাফর! মন সুস্থির কর, বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম কর, আমরা পুত্রবধূ ও পৌত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করি। বাবা! পিতা মাতার মনে ক্লেশ দেওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য?

অধোমুখে বিনীত স্বরে মহামনা জাফর বলিলেন, “মা! এ নরাধমের বিবাহের জন্য আপনারা হৃদয়ে যন্ত্রণা পাইতেছেন, ইহা ত আমাকে আর বলেন নাই,—পিতা মাতার আজ্ঞা পালনই পুত্রের কর্ত্তব্য। আপনাদের আদেশ প্রতিপালন জন্য আমি জাহান্নমে যাইতেও প্রস্তুত আছি।

পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত জাফরখাঁ! তুমি ধন্য! কিন্তু দর্শনাবধি যে মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছ, সেই আরাধ্য দেবীকে কি বিস্মৃত হইতে পারিবে? না, তাহা অসম্ভব! ভক্তি প্রণোদিত হইয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন মহতের কার্য্য। তুমি মহৎ, তুমি আদর্শ পুত্র।

জাফরখাঁ মাতা ও ভগিনীর সহিত স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উদ্যান হইতে গৃহে আগমন জনিত পরিশ্রমে

বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এই কথা মাতাকে বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

রজনীর আহারাদির পরে, সেনাপতি চিকিৎসক সহ জাফর-খাঁকে দেখিতে আসিলেন। চিকিৎসক বহুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, জ্বর আজ আবার বাড়িয়াছে। বিগত পরশ্ব হইতে অদ্য দিবাভাগ পর্য্যন্ত যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে ত জ্বর বৃদ্ধির কোন লক্ষণই অনুভব করিতে পারি নাই। সহসা এরূপ বৃদ্ধির কোন কারণই বুঝিতে পারিতেছি না।

সেনাপতি ব্যস্তভাবে অন্যান্য চিকিৎসকদিগকে আনয়ন জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

বুদ্ধিমতী করিমন্নেছা সকলি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।
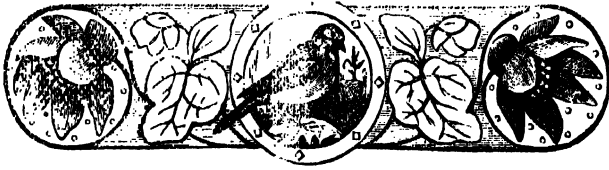
একাদশ পরিচ্ছেদ।

> পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
> কি করিব ? কি হ'বে উপায় ?
>
> চণ্ডীদাস।

প্রভাতে সুপ্ত জগৎ জাগরিত হইল। বালারুণ ধীরে ধীরে পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বসুধাকে আলোকিত করিল।

অহল্যা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া এক খানি পুস্তক হস্তে অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিল। কিছুকাল প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রন্ধন-শালায় উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী প্রাতরাশের আয়োজনে নিবিষ্টা, অহল্যাকে দেখিতে পাইল না।

অহল্যা পার্ব্বতীকে কিছুই না বলিয়া উদ্যানে গমন করিল। একটি বকুল বৃক্ষ তলে যাইয়া কতক গুলি পতিত পুষ্প সংগ্রহ করিল। অহল্যা ফুল জড় করিতেছে কেন,—মালা গাঁথিবে কি ? ফুলগুলি বৃক্ষ তলেই রাখিয়া অহল্যা সে স্থান ত্যাগ করিল। একটি শেফালিকা বৃক্ষের নিকটে যাইয়া এক খানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল। ভাবিল পঁথি খানি পাঠ

করিবে। পুঁথি খানি সেখ মসালহোদ্দিন সাদি প্রণীত বুস্তাঁ। নানা উপদেশ পূর্ণ বুস্তাঁ অহল্যার ভাল লাগিল না। গ্রন্থ বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইল, পুনরায় ঊর্দ্ধ নেত্র বিনত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "হায়! বামন হইয়া কেন আকাশের চাঁদ হাতে ধরিবার বাসনা করিতেছি! আশা করিয়া নিরাশ হওয়া অপেক্ষা আশা না করাই ত ভাল। যে আশা এ জগতে কখন পূর্ণ হইবে না, সেই আশায় কেন আশান্বিত হইলাম? হায়, তাঁহাকে কেন দেখিয়াছিলাম! যদি দেখিলামই ত ভুলিলাম কেন? ভুলিয়া প্রাণ হারাইলাম কেন? দেখিয়াছি বলিয়া কি আমি দুঃখিতা? না, জন্ম জন্ম যেন তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন মন জুড়াইতে পাই। হায়! তাঁহাকে দেখিব না, তবে আর দেখিবার এ জগতে কি আছে? আহা! কি দয়া, কি মমতা, কি অনুপম রূপ! তিনি প্রলাপ বলিতে বলিতে অভাগিনীর নাম করিয়াছিলেন,—সার্থক আমার জীবন যে তাঁহার বদন হইতে এই ইতর হড্ডিক কুমারীর নামোচ্চারিত হইয়াছে। জগদীশ্বর! তোমার চরণে এই ভিক্ষা চাই, যেন সেই পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে— সেই পবিত্র জাফর নাম জপ করিতে করিতে এ জীবন অন্ত হয়। ইহা ব্যতীত আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই। বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে অহল্যার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুজল পতিত হইল।

সহসা পার্ব্বতী নিকটে আসিয়া বলিল, "দিদি! এমন করিয়া দিন রাত্রি ভাবিলে, শরীর ক দিন টিকিবে? কর্ত্তা বকিতেছেন, আহার প্রস্তুত হইয়াছে, চল উপরে যাই।"

অহল্যা পার্ব্বতীর সহিত অট্টালিকার দ্বিতলে পিতৃ-সদনে উপস্থিত হইল। আহারে প্রবৃত্তি নাই, তথাপি পিতার ভয়ে সকলের সহিত কিঞ্চিৎ আহার করিল। আহারান্তে সকলে একত্রে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার সাংসারিক আলাপাদি করিতেছেন, এমন সময়ে বিবি ফাতেমার জনৈক ভৃত্য আসিয়া অহল্যাকে বিবি ফাতেমার আহ্বান সংবাদ জানাইল। অহল্যা অকারণ অধিক কাল বিলম্ব না করিয়া, ফাতেমা প্রেরিত শিবিকায় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন। আজ পার্ব্বতীও তাহার সমভিব্যাহারে চলিল। সে সকালেই সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছিল।

হায়, সরলা অহল্যা! তুমি বিবি ফাতেমাকে দেখিয়া কতই সুখী হইবে ভাবিতেছ, কিন্তু সে সুখ যে কি ভয়ঙ্কর দুঃখে পরিণত হইবে, তাহা এখন কিছুই অবগত নহ। অহো! শঠের শঠতাজালে আবদ্ধা সরলা হরিণী অহল্যা সতীর পরিণাম চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যুড়াতে জীবন, শীতল ছায়ায়
বসিনু মনের সুখে,
কে জানিত হায়! কোটর হইতে
ভুজঙ্গ দংশিবে বুকে।

নবীন চন্দ্র সেন।

মধ্যাহ্ন সময়। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর রশ্মি যেন অনল-কণার ন্যায় জগৎ দগ্ধ করিতেছে। জনৈক দ্বারবান সহ পরিশ্রান্তা পার্ব্বতী বিষণ্ণ-বদনে দ্রুতপদে আলয়ে আগমন করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ নির্গত হইতেছে, কেশ আলু-থালু, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে।

অহল্যার পিতা পার্ব্বতীকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার্ব্বতি! তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? অহল্যা ভাল আছে ত? বিবি ফাতেমার ত কোন অসুখ হয় নাই?

পার্ব্বতী কাঁদিয়া বলিল "কর্ত্তা মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুরাচার পাষণ্ডগণ অহল্যাকে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে।"

অহল্যার মাতা এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র উচ্চ রোলে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

অহল্যার পিতা বলিলেন, "পার্ব্বতী! তুমি কি বলিতেছ, কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। কে অহল্যাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিবে?"

পার্ব্বতী বলিল "আমি শিবিকার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলাম, কতক দূর যাইয়াই দেখি, আমরা এক নূতন পথে যাইতেছি। বিবি ফাতেমার ভৃত্য অগ্রে যাইতেছিল, দেখিলাম সে অতি দ্রুত পদে যাইতেছে। বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কোন্ পথে লইয়া যাইতেছ? তাহারা বলিল "চল, মাই! এই পথই সোজা"। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সেই ভৃত্যটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। বাহকেরা এত দ্রুত যাইতেছিল যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি তাহাদিগের সঙ্গে চলিতে পারিলাম না, পিছাইয়া পড়িলাম। তাহারা বহুদূরে যাইয়া বাম দিকের একটা মোড়ে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে শিবিকা কিংবা বাহক আর কিছুই দেখিলাম না। তখন যথাসাধ্য দৌড়িয়া সেই মোড়ের মাথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, সেখান হইতে তিন দিকে তিনটী গলি গিয়াছে, কোন্ গলি ধরিয়া শিবিকা সহ বাহকগণ গিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া, সেখানকার দোকানি ও পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা তাচ্ছল্য ভাবে বলিল 'কত শিবিকা এপথে যাইতেছে আমরা কি তাহার তালিখা রাখি?' অনন্যোপায় হইয়া একজন বৃদ্ধকে সেনাপতির ভবনের কথা শুধাইলাম। সেই বৃদ্ধ বলিল, 'মা! এদিকে ত সেনাপতির ভবন নহে। আমার সহিত আইস, পথ দেখাইয়া দিব।' আমি তাঁহার সহিতই চলিলাম।

অনেক পথ চলিয়া সেনাপতির ভবন দেখিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করিয়া ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ব্যস্তভাবে বিবি ফাতেমার সমীপে যাইয়া অহল্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন 'অহল্যা ত এখানে আইসে নাই। আমিও ত তাহাকে আনাইবার জন্য কাহাকেও পাঠাই নাই।' আমি সেই ভৃত্যের কথা ও তাহার যে পরিচয় জানিতাম তাহা বলিলাম। তাঁহারা ভৃত্যকে চিনিতে পারিলেন। বিবি ফাতেমা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, তিন দিন হইতে সেই পাপিষ্ঠ নরাধম ভৃত্য তাঁহাদের আলয় হইতে পলায়ন করিয়াছে। বিবি ফাতেমা কাল বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার পিতাকে সকল সংবাদ জানাইলেন। সেনাপতি মহাশয় অহল্যার অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে বহু লোক জন প্রেরণ করিয়াছেন। সেনাপতি স্বয়ং আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'এই দ্বারবানের সহিত তুমি বাটী গমন কর, আমি শীঘ্রই তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

এতক্ষণ অহল্যার মাতাই ক্রন্দন করিতে ছিলেন, সকল কথা শুনিয়া অহল্যার পিতাও কাঁদিতে লাগিলেন। কেহই সান্ত্বনা করিবার নাই, সকলেই ক্রন্দন করিতেছে।

অহল্যার মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "অহল্যা! বিধাতা তোমাকে কেন রূপবতী করিয়াছিলেন? আমরা কেন দিল্লী আসিয়াছিলাম? মুষ্টি ভিক্ষাদ্বারা উদর পোষণ করিয়াও যদি দিনান্তে তোমার মুখে একবার মা, মা, সম্বোধন শ্রবণ করি. এ সুখ সম্পত্তি ভোগ অপেক্ষা তাহা আমার শতগুণে আনন্দ-

দায়ক। এ প্রকাণ্ড নগরে আমার অহল্যাকে কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? হায়! আমার অহল্যা যে অতি অভিমানিনী, হয়ত এতক্ষণ সে আত্মহত্যাই করিয়াছে।

অহল্যার পিতা মাতার বিলাপ ও ক্রন্দনের ইয়ত্তা নাই। শোকে ও দুঃখে দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অহল্যার মাতা পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নাথ! তুমি এখনই সেনাপতির সমীপে যাইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বল যে, যেরূপেই হউক্ আজই আমার অহল্যার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আজি তাহাকে না দেখিতে পাইলে আমি কখনই এ প্রাণ রাখিব না।"

অহল্যার পিতাও এইরূপই ভাবিতেছিলেন, তিনি সেনাপতির ভবনে গমন মানসে অট্টালিকার দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, হস্তী আরোহণে সেনাপতিই তাঁহার ভবনাভিমুখে আগমন করিতেছেন।

মহানুভব সেনাপতির আগমন মাত্র অহল্যার পিতা ও মাতা উভয়ে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়! আমার অহল্যা কোথায়? এ দিল্লীনগরে আপনি ব্যতীত আমাদের আর কে আছে? আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সহায় থাকিতে, কে আমাদের প্রতি এরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতে সাহসী হইল? এখনই আমাদের অহল্যাকে আনাইয়া দিন, নতুবা আমরা আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।"

তাহাদের এইরূপ নানা শোকোদ্দীপক বাক্যে সেনাপতিরও চক্ষে জল আসিল। নয়নাশ্রু রুমালে মুছিয়া, তিনি কাতর

অথচ স্থির-স্বরে বলিলেন, "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। এক্ষণে আসুন, পরামর্শ করা যাউক। উতলা কিম্বা শোকাতুর হইলে কিছুই ফলোদয় নাই, বরং কার্য্যোদ্ধারের বিঘ্ন ঘটিবে।"

সেনাপতির বাক্যে তাঁহারা কিয়ৎকাল পরেই ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন। সকলেই অট্টালিকার দ্বিতলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। সেনাপতি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! অহল্যার অনুসন্ধান জন্য আমি প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয়বিধ চর নিযুক্ত করিয়াছি। যে সকল গুপ্তচর যুদ্ধাদির সময়ে অলৌকিক সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ সকল আনয়ন করে, তাহারা যে অহল্যার অনুসন্ধানে অপারগ হইবে এরূপ বোধ হয় না। ঘটনাটী যে কোন ক্ষমতাশালী দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার সংশয় নাই। সামান্য লোকে কখনই আমার ভৃত্যকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশেষতঃ দিনের বেলায় সূর্য্যালোকে প্রকাশ্যভাবে শিবিকা পাঠাইয়া হরণ করা সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। নগরের প্রধান শান্তিরক্ষককেও অনুসন্ধানকারীদিগের বিশেষরূপ সহায়তা করিতে আদেশ করিয়াছি। অদ্য রজনীতেই গুপ্তচরগণ আমাকে অনুসন্ধানের ফলাফল জানাইবে। আমি এখানে আর বৃথা সময় নষ্ট করিব না। আমার বিবেচনায় আগামী কল্য সম্রাট দরবারে আপনি উপস্থিত হইয়া এবিষয়ের বিচার-প্রার্থী হউন। যাহাতে দরবারে সহজে আপনার আবেদন গ্রাহ্য হয়, অকারণে কালব্যাজ না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা আমি

করিব। বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিবেন না। আপনি ধৈর্য্যধারণ না করিলে আপনার পত্নী অধিকতর অধীরা হইবেন; আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপে কার্য্য করিলে, আপনি বিফল-মনোরথ হইবেন না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সুবিচারকের আদর্শ সম্রাট হুমায়ুন, দুর্ব্বৃত্ত দমনে কখনই পরাঙ্মুখ নহেন।"

সেনাপতি আর তথায় কালবিলম্ব না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আশ্বাসবাক্যে অহল্যার পিতা মাতাও অপেক্ষাকৃত চিত্ত সুস্থির করিলেন।
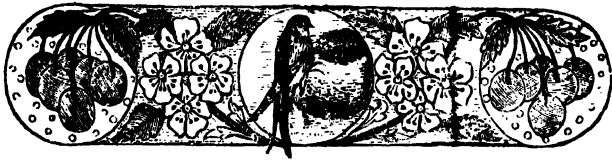
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কিছুইত হোল না !
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয় বেদনা।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই !

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

রজনী অর্দ্ধযাম গত হইলে, দোস্তমহম্মদ একটি বারবিলাসিনীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মির্জ্জাগোলামের আলয়াভিমুখে যাইতে লাগিল।

দোস্তমহম্মদ পাষণ্ডদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও মিষ্টভাষী। তাহার হৃদয় শঠতায় আতটপূর্ণ। স্বার্থ সাধন জন্য সে না করিতে পারে, এমন কুকর্ম্ম জগতে নাই।

বারবিলাসিনীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই সে ভাবিতে লাগিল, হা পরমেশ্বর ! কে বলে তুমি সুবিচারক।—কোন্ গুণে মির্জ্জাগোলাম ধনবান ও ক্ষমতাশালী, আর কি অপরাধে আমি দরিদ্র ও অক্ষম ? কোন্ পূণ্যবলে পৃথিবীর যাবতীয় সুখের

সামগ্রী মির্জা ভোগ করিতেছে? ঈশ্বর! আহা, বলিহারি তোমার বিচার! সুন্দরীটিকে দেখিলাম প্রথমে আমি, আর ভোগ করিবে মির্জাগোলাম! কখন না। মির্জাগোলাম! এই দোস্তমহম্মদ জীবিত থাকিতে এমন আশা তুমি কখনও করিও না। আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার তুমি কে? মূর্খ! তোমার উপভোগের জন্য বুঝি অহল্যার সন্ধান করিয়াছিলাম? গণ্ডমূর্খ! অর্থব্যয় তোমার, কার্য্য উদ্ধার করিবে তুমি, ফল লাভ করিব আমি। যে তীব্রচূর্ণ আজি তোমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি, ইহাতেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হেকিম বলিয়াছেন, এই চূর্ণ উদরস্থ হইলে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত মানুষ অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। মূর্খ! আজি তোমার অর্থদ্বারা তোমারই সর্ব্বনাশ করিব। মিষ্ট কথায় যদি সুন্দরীকে সম্মতা করিতে পারি, তবে আর আমাকে পায় কে? আগামী কল্যই সুন্দরীকে এমন স্থানে রক্ষা করিব যে, সহস্র মির্জাগোলামও অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইবে না।

দোস্তমহম্মদ ভাবিতে ভাবিতে মির্জার বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইল। মির্জা ইয়ারদলের সহিত সুরাপান করিতেছিল, দোস্তমহম্মদকে দেখিয়াই সহাস্যে বলিল, "এই তোমারই নাম হইতেছিল, দোস্ত!"

দোস্তমহম্মদ উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নাম হইতেছিল কেন মির্জা?"

মির্জা বলিল "তোমার নাম করিব না ত কা'র নাম করিব?

তোমার মত আমার হিতৈষী সুহৃদ্ কে? আজি যে রত্ন ঘরে আনাইয়াছি, সে ত এক প্রকার তোমারই প্রসাদাৎ।”

দোস্তমহম্মদ। আমার প্রসাদাৎ কি? সে তোমার নিজের ক্ষমতাই বল। এখন ও কথা থাক্, কাজের কথা বল। সুন্দরী ত বড় একটা বাড়াবাড়ি করে নাই? আহারাদি করিয়াছিল কি? কোন গোলযোগ করে নাই ত?

মির্জা। ভাই! বনের পাখী কি সহজে পোষ মানে? পিঞ্জরে আটকাইয়াছি, থাকিতে থাকিতেই পোষ মানিবে। কোন্ পাখীটা সহজে পোষ মানিয়াছে ভাই? এ চিরিয়া সব চিরিয়ার সেরা।

দোস্ত। চিরিয়া ত পিঁজরায় আছে, ভয়ের কি আশঙ্কার কারণ আর নাই। দুই দিনে না হউক, দশ দিনেও ত পোষ-মানিবে। পোষ না মেনে যা’বে কোথা? তা-এখন দুই এক পেয়ালা মদ টদ আমাদের দাও। আজ ভাই জমকাল রকমের মজালিস করিতে হইবে। বোতলের মদে আজি কুলাইবে না, আস্ত পিপে চাই।

মির্জা। তোমার উপরই ভার দিলাম, তুমিই সব আয়োজন কর। ভাই! আমি আজি বেশী নেসা করিব না। আমি মনমোহিনীকে দূর হইতে মাত্র দেখিয়াছি, এখনও সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমালাপ করি নাই। ভাবিয়াছি কিঞ্চিৎ সুরা পান করিয়া মনের স্ফূর্ত্তি হইলে প্রেয়সীর সম্ভাষণে যাইব।

দোস্ত। সুরাপান করিবে বৈ কি? তা না হ’লে ভাল কথা—মন ভিজান কথা—দুই চারিটা রসিকতার কথা কিসের জোরে

খেলিবে? সুরাপান করিবে বৈকি? আজি ত সুরাপানেরই দিন। ভাই! সুরাপান করিবে না ত কি করিবে? সুরার তুল্য আছে কি?

মির্জাগোলামের আদেশে ভৃত্যগণ প্রচুর সুরা আনিয়া উপস্থিত করিল। দোস্তমহম্মদ স্বহস্তে পেয়ালা পূর্ণ করিয়া মির্জাকে পান করিতে দিল। মির্জা পান করিলে সকলেই এক এক পেয়ালা পান করিল। ক্রমে মাত্রা চড়িতে লাগিল। অশ্রাব্য ভাষা, অশ্রাব্য সঙ্গীতে কক্ষ পূর্ণ হইল।

দোস্তমহম্মদ আজি অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক আমোদ করিতেছে। কত মন ভুলান মিষ্ট কথাই বলিতেছে, কখন গাইতেছে, কখন বা নাচিতেছে। আমোদে মাতোয়ারা

পানাধিক্যে যখন সকলেরই নেসা সপ্তমে চড়িয়া উঠিল, দোস্তমহম্মদ সেই সময়ে হেকিম দত্ত চূর্ণ মিশ্রিত এক পাত্র সুরা অতি আদরের সহিত মির্জাকে পান করিতে দিল, মির্জা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় তাহা পান করিল। পানাধিক্যে আজি সকলেই প্রায় উন্মত্ত। মির্জা আর অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, মসলন্দের উপরেই শয়ন করিল। পারিষদগণের মধ্যেও কেহ কেহ সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল, কেহ কেহ টলিতে টলিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

দোস্তমহম্মদ নেসার ভান করিয়া পড়িয়াছিল, এখন সময় বুঝিয়া উঠিয়া বসিল। স্খলিত স্বরে দুই একবার মির্জাকে ডাকিল, মির্জা উত্তর করিল না, সুরা ও চূর্ণের তেজে মির্জা এখন অচৈতন্য।

নরাধম দোস্তমহম্মদ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিল। ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গুপ্ত গৃহের অভিমুখে যাইতে লাগিল। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল দুইজন প্রহরী সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দ্বারবান দ্বয় দোস্তমহম্মদকে দেখিয়া সম্মানের সহিত সেলাম করিল। দুরাচার গৃহের সন্নিকটে যাইয়া দ্বারে আঘাত করিল, কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। পাপিষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল, ভিতর হইতে বামাস্বরে প্রশ্ন হইল—কে ?

দোস্তমহম্মদ বলিল, "আমরাই।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল—আপনি কে ?

দোস্তমহম্মদ বলিল—আমি দোস্তমহম্মদ। বিশেষ প্রয়োজন আছে, দ্বার খুলিয়া দাও।

একটি প্রৌঢ়া পরিচারিকা দ্বার উন্মোচন করিল। দোস্তমহম্মদ সেই পরিচারিকাকে বলিল,—মির্জা সাহেব কোন একটি গোপনীয় কথা নূতন বিবিকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; সে কথা তোমার সম্মুখে বলিতে পারি না। তুমি একটু স্থানান্তরে যাও।

পরিচারিকা দোস্তমহম্মদকেও স্বীয় প্রভুর ন্যায় ভয় ও মান্য করিত; সে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল।

নরাধম নারকী দোস্ত মহম্মদ গৃহাভ্যন্তরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, কক্ষের পার্শ্বে সর্ব্বাঙ্গ-বসনাবৃতা একটী রমণী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।

পাঠক! বলিতে হইবে কি, যে ইনিই আমাদের অহল্যা ?

নিষ্ঠুর ব্যাধ কর্ত্তৃক জালে আবদ্ধ সরলা হরিণীর ন্যায় সরলা অহল্যাও বন্দিনী।

পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক দোস্তমহম্মদ অহল্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, সুন্দরি! আমাকে দেখিয়া আতঙ্কিতা হইও না। জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি শত্রু ভাবে আসি নাই—তোমার উদ্ধার কামনায় আসিয়াছি। শুন সুন্দরি! মির্জা গোলাম অতি নরাধম। সে প্রণয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করে না, প্রতি দিন নব-নব সুন্দরীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী। চন্দ্রবদনি! আমি এখনও অবিবাহিত। তুমি যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর, তবে এ কারাগার হইতে এখনই তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি। প্রাণাধিকে! তোমার রূপলাবণ্যে ও গুণগ্রাম শ্রবণে আমি একেবারে বিমোহিত হইয়াছি। সুন্দরি! আমাকে নিরাশ করিও না। তোমার এ কিঙ্কর নিতান্ত অক্ষম পুরুষও নহে। এ কারাগার হইতে যে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ করিও না। দেখিলে ত, পরিচারিকা এবং গৃহরক্ষকেরা আমার আজ্ঞা অবনত শিরে মান্য করিল। বিধুমুখি! আমি আমার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাকে কখনও অবহেলা করিব না। যত দিন জীবিত থাকিব, তুমি ভিন্ন অপর রমণীর মুখাবলোকন করিব না। চারুশীলে! আমার সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মতা হইয়া এ দগ্ধ হৃদয় শীতল করিবে কি?

অহল্যা ভয়ে অধিকতর জড়সর হইল। নরাধম প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় নানা কথা বলিল, কিন্তু অধিকক্ষণ গুপ্তগৃহে

থাকিতে তাহার সাহস হইল না। রজনীও প্রায় অবসান হইয়া আসিতেছিল। পাপিষ্ঠ যাইবার সময়ে বলিল, রূপসি! স্ত্রীলোকের লজ্জাই শত্রু। তুমি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমার সরল প্রার্থনার মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, অদ্য আমি চলিলাম, আগামী রজনীতে পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া দুরাচার দোস্ত মহম্মদ অহল্যার বসনাবৃত দেহের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে গুপ্তগৃহ হইতে প্রস্থান করিল। পরিচারিকা পুনরায় গৃহের অভ্যন্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কনক আসনে বসে দশানন বলী,
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে,
সরস কমল কুল বিকসিত যথা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রভাত হইয়াছে। ধীরে ধীরে বালারুণ পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া জগতের প্রাণী-মণ্ডলীকে বিশ্রামের পরে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। প্রাণী জগতে আবার কোলাহল উপস্থিত হইল। ধার্ম্মিক মুসলমানগণ জুম্মামস্‌জিদে গমন করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিবিষ্ট হইলেন। তৃণপূর্ণ মাঠে গৃহপালিত পশুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। বিহগগণ প্রভাতি গাইয়া এক্ষণে আহারান্বেষণে নিবিষ্ট।

অহল্যার পিতা সেনাপতির মন্ত্রণানুসারে বাদসাহের দর-বারে গমন জন্য অধীরভাবে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,

এক্ষণে দরবারে গমনযোগ্য বেশ ভূষায় সজ্জিত হইলেন। অতি সাবধানে ও যত্নে বাদসাহ প্রদত্ত অঙ্গুরীটী দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে পরিধান করিলেন। জগদীশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া বাদসাহের ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে ভবন সমক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সিংহ-দ্বারের উপরে নহবত খানায় শ্রবণ-মুগ্ধকর সুমধুর নহবত বাদিত হইতেছে। শত শত সশস্ত্র প্রহরী বীর-বেশে প্রবেশ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জনৈক সিপাহীকে সেনাপতির প্রদত্ত ছাড়-চিঠি দেখাইয়া, সভয়ে পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ। প্রতি প্রকোষ্ঠ দ্বারে, দ্বার রক্ষক সিপাহিদিগকে সেনাপতির প্রদত্ত ছাড়-চিঠি দেখাইয়া, বাদ-সাহের দরবার ভবনের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে জন-স্রোত ভেদ করিয়া সুপ্রশস্ত দরবার ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর হইতে দেখিলেন, মহা প্রতাপান্বিত দিল্লীর বাদসাহ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মহামনা হুমায়ুন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সিংহাসনের পশ্চাতে স্বর্ণ দণ্ডোপরি মণিমুক্তা-খচিত ছত্র, তদুপরি বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মখমলের চন্দ্রাতপ, সিংহাসনের দুই পার্শ্বে চামরধারী চামর ব্যজন করিতেছে। বাদসাহের বামে ও দক্ষিণে মন্ত্রিগণ, সেনাপতি, প্রধান প্রধান সেনানায়ক ও ওমরাহগণ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।

বাদসাহের অপূর্ব্ব সৌম্য মূর্ত্তি এবং দরবারের গম্ভীর দৃশ্য ও অপরিসীম শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অহল্যার পিতা ত্রাসে

এবং হর্ষে শিহরিয়া উঠিলেন। দরবারের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে জনৈক উচ্চ সম্মানধারী সেনানায়ক তাঁহার গতিরোধ করিলেন। সেনাপতির নিকটে অহল্যার পিতা দরবারের নিয়মাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেনানায়ক তাঁহার গতিরোধ করিলে, তিনি বিনয়ের সহিত সেলাম করিয়া বলিলেন, "আমি জাতিতে হড্ডিক, এক্ষণে পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এই দিল্লী নগরে বাস করিতেছি। সম্প্রতি আমি দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছি। মহামান্য সেনাপতি মহাশয় তাহা অবগত হইয়া বাদসাহের নিকটে আবেদন করিতে অনুমতি করিয়াছেন এবং দরবারে প্রবেশ লাভ জন্য তিনিই ছাড়-চিঠি দিয়াছেন।" এই বলিয়া সেনাপতি প্রদত্ত ছাড়-চিঠি তাঁহাকে দেখাইলেন।

সেনাপতি সেই স্থানেই অহল্যার পিতাকে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিয়া বাদসাহের সম্মুখে গমন করিলেন এবং সামরিক রীত্যনুসারে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "সাহেন সা! একজন হড্ডিক এই নগরে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া বিচার প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"

বাদসাহ তাঁহাকে আনয়ন জন্য ইঙ্গিতে আদেশ প্রকাশ করিলেন।

সেনানায়ক অহল্যার পিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দরবারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আতঙ্কে অহল্যার পিতার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছিল। বাদসাহের সমীপে উপস্থিত হইয়া একখানি রৌপ্য পাত্রে পাঁচটী সুবর্ণ মুদ্রা নজর স্বরূপ

উভয় হস্তে ধারণ করিয়া সিংহাসনের কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়-মান রহিলেন।

বাদসাহের মন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট ছিল, সহসা তাঁহার দৃষ্টি সিংহাসন-সম্মুখস্থ অহল্যার পিতার হস্তোপরি পতিত হইল। হীরকাঙ্গুরী দেখিয়া তিনি অহল্যার পিতার মুখের দিকে তাকাইলেন। মহানুভব বাদসাহ হুমায়ুন সহসা সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। দরবারের সকল লোকই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডায়মান হইল। বাদসাহ সিংহাসনের সোপান অতিক্রম করিয়া অহল্যার পিতার অতি নিকটে গমন করিলেন এবং উভয় হস্তবেষ্টনে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়-বন্ধো! শারীরিক কুশল ত? অহল্যা ভাল আছে ত?"

দরবারের সমস্ত লোক এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ সেনাপতি বৈরাম খাঁর বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না।

বাদসাহ অহল্যার পিতার হস্তধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং সেই উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, অহল্যার পিতা কর্ত্তৃক তিনি কিরূপ উপকৃত, তাহা সকলের সম্মুখে গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিলেন।

দরবার হইতে "জয় বাদসাহের জয়, বাদসাহের জীবন রক্ষক দীর্ঘজীবী হউন" প্রভৃতি আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ সূচক ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

বাদসাহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং অহল্যার

পিতাকে দরবারের সর্ব্বোচ্চ সম্মাননীয় আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। দরবারস্থ সমস্ত লোক পুনরায় স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইল।

মহানুভব বাদসাহ অহল্যার পিতার নিকটে একে একে সমস্ত কাহিনী অবগত হইয়া সেনাপতির প্রতি আদেশ করিলেন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অহল্যার সন্ধান করিয়া তাহাকে তাহার পিতার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে এবং অত্যাচারকারীদিগকে বিচারার্থ আগামী কল্য দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে।

সেনাপতি সামরিক প্রথায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "বাদসাহের আদেশ শিরোধার্য্য।" পরে বলিলেন, "সাহেন সা! আপনার এই ভৃত্যও মহানুভব অহল্যার পিতার নিকটে বিশেষ উপকৃত।"

সেনাপতি, বিবি ফাতেমা ও বাহাদুর খাঁ ঘটিত সমস্ত কাহিনী বিশদরূপে প্রকাশ করিলে বাদসাহ বলিলেন, তবে কি ইহাকে আমাদিগের উপকারার্থই জগদীশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন?

দরবারস্থ সমস্ত লোক ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

সেনাপতি বৈরাম খাঁ পূর্ব্বদিন রজনীতেই অহল্যার হরণকারীদিগের সন্ধান অবগত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা হুমায়ুন রাজকার্য্য সমাধান্তর পুনরায় অহল্যার পিতার সহিত পারিবারিক বৈষয়িক প্রভৃতি নানাবিধ কথোপকথন করিলেন। অহল্যার এবং তদীয় পিতার মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাসের কথা অবগত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন। অবশেষে সহাস্য বদনে দরবারের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর দিকে নেত্রপাত

করিয়া বলিলেন, "ওমরাহগণ! আমি আমার এই পরম বন্ধুর নিকটে বিশেষ উপকৃত। অদ্য কথা প্রসঙ্গে আমাদের ধর্ম্মে ইঁহার বিশ্বাসের কথা অবগত হইয়া আমি অপরিসীম সুখী হইয়াছি। সম্ভ্রান্তগণ! আমি বন্ধুকৃত সেই মহদুপকার স্মরণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যুপকার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বলিতেছি, অদ্য হইতে ওমরাহদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, এবং আজি হইতে ইঁহার নাম আমীর ওয়াজিদ খাঁ হইল। পরে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন,—অদ্য হইতে আমীর ওয়াজিদ খাঁ রাজকোষ হইতে মাসিক এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

আদেশ মাত্র কোষাধ্যক্ষ বিবিধ কারুকার্য্য বিশিষ্ট উজ্জ্বল হীরক খচিত খেলাত অর্থাৎ পরিচ্ছদ এবং ঢাল ও তরবারি আনয়ন করিয়া অহল্যার পিতা আমীর ওয়াজিদ খাঁকে প্রদান করিলেন। সর্ব্ব সাধারণের সঘন জয়ধ্বনিতে দরবার পূর্ণ হইল।

ক্ষণকাল পরে বাদসাহ দরবার ভঙ্গ করিয়া স্নানাগারে গমন করিলেন। আমীর ওয়াজিদ খাঁ, সেনাপতি এবং জাফর খাঁর সহিত হস্তী আরোহণে নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পাঠক! আজি অহল্যার পিতার ন্যায় জগতে সুখী কে? গ্রন্থকার দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন, আমীর ওয়াজিদ খাঁ হইতেও আর একজন অধিকতর সুখী। তিনি সেনাপতি বৈরাম খাঁর পুত্র মহামতি জাফর খাঁ!
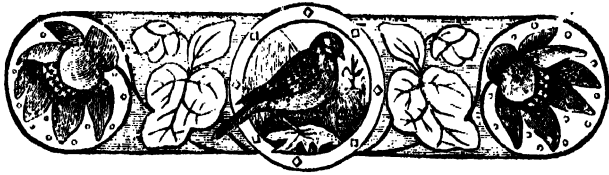
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র তৃণ ফুল এক জন্মে অন্ধকারে,
দুই দণ্ড বেঁচে থাকে কীটের আগারে.
শুকায়ে পড়ে সে নিজ কাঁটার মাঝারে,
নিজেরই কাঁটার মাঝে সমাধি তাহার।

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

রে মূঢ় মানব! কেন তুমি পুণ্যের বিমলালোক পরিত্যাগ করিয়া, পাপের অন্ধকার গহ্বরে অন্ধের ন্যায় বিচরণ কর? নিমেষের তরেও পাপীর হৃদয় শান্তিলাভ করিতে পারে কি? মানব! তুমি পাপের আপাত মধুর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, পরিণামে কেবল অশান্তি, উদ্বেগ, অতৃপ্তি মাত্র লাভ কর; তবে কেন সে পথে যাও?

আজন্ম পাপে-নিমজ্জিত দোস্তমহম্মদ! পাপ কর্ম্মই তোমার জীবনের ব্রত। সে ব্রতে কখন শান্তিলাভ করিয়াছ কি? দুরাচার! এখনও দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর।

মির্জাগোলাম! তুমি এ ভাবে রহিয়াছ কেন? তোমার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া সকলে বিষণ্ণ বদনে তোমার মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে কেন? তোমার কি হইয়াছে? ঐ দেখ, তোমার

হতভাগিনী সহধর্ম্মিনী নীরবে রোদন করিয়া অশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিতেছেন। পামর! ইঁহাদের স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি তুমি চিরকাল উপেক্ষা করিয়াছ; কিন্তু আজ ইঁহারা ব্যতীত তোমার জন্য আর কেহ প্রকৃত ব্যথিত কি?

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে, মির্জা গোলাম এখনও অচৈতন্য। চিকিৎসক রোগের মূল কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। মির্জা গোলামের জননী দিল্লী নগরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনাইবার জন্য ভৃত্য প্রেরণ করিয়াছেন। সম্রাজ্ঞীর অবগতির জন্যও একজন বিশ্বস্ত খোজা সম্রাট ভবনে প্রেরিত হইয়াছে।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না—সে গত হইতেছে, তথাপি মির্জাগোলামের চৈতন্য জন্মিল না। অপরাহ্নে ভৃত্যসহ আরও দুই জন হেকিম উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রোগীর অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সহসা একজন হেকিম বলিলেন, "দোস্তমহম্মদ এখানে আছে কি?

একজন ভৃত্য বলিল, "তিনি বহির্বাটীতে আছেন।"

হেকিম বলিলেন, "দোস্ত মহম্মদকে আমার প্রয়োজন আছে।'

ভৃত্য বহির্বাটীতে যাইয়া দেখিল দোস্ত মহম্মদ নাই। সে আসিয়া হেকিমকে বলিল "তিনি বহির্বাটীতেই ছিলেন, এইমাত্র কোথায় গিয়াছেন।

হেকিম উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এক প্রকার চূর্ণ আছে, তাহা উদরস্থ হইলে রোগীর যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইঁহারও সেইরূপ হইয়াছে। বিগত কল্য দোস্ত-

মহম্মদ অন্য একটী কারণ জানাইয়া আমার নিকট হইতে সেই চূর্ণ ইহাকে সেবন করাইবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। দোস্ত মহম্মদকে ইহার একজন সুহৃদ বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া জানি; বিশেষতঃ তিনি যে ঘটনা জানাইয়া আমার নিকট হইতে সেই চূর্ণ লইয়াছিলেন, সেরূপ ঘটনায় এই চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ভাল করি নাই। যাহা হউক, আপনারা ভাবিত হইবেন না। ইহার প্রতিকারের ঔষধ আমি অবগত আছি, তাহা প্রয়োগ করিলেই সমস্ত কুলক্ষণ দূরীকৃত হইয়া চৈতন্যোদয় হইবে।

সহসা সেই সময়ে একটা কোলাহল উপস্থিত হইল। কেহ কেহ কক্ষের বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, কয়েক জন অশ্বারোহী সহ সেনাপতি বৈরাম খাঁ এবং আরও কতিপয় ভদ্রলোক সেই ভবনের দিকে আগমন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সেনাপতির ইঙ্গিতানুসারে এক জন গুপ্তচর, যে প্রাঙ্গনে গুপ্তগৃহ অবস্থিত, তাহা অশ্বারোহীদিগকে দেখাইয়া দিল।

একজন সেনানায়ক গুপ্ত গৃহের রক্ষক দ্বয়কে বলিলেন, "আমরা বাদসাহের আদেশানুসারে বন্দীকে মুক্ত করিতে এখানে আসিয়াছি। তোমরা দ্বার পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর।"

রক্ষকদ্বয় অবনত মস্তকে দ্বার পরিত্যাগ করিল। সেনানায়ক দ্বারে আঘাত করিয়া দেখিলেন, উহা ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যে কেহ কক্ষের

ভিতরে থাক, দ্বার উদ্‌ঘাটন কর। বাদসাহের অনুমত্যানুসারে স্বয়ং সেনাপতি বন্দীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।” বারম্বার আঘাতেও দ্বার খুলিল না।

বিগত রজনীতে দুরাত্মা দোস্তমহম্মদ, সেই কক্ষ হইতে চলিয়া গেলে পরিচারিকা পুনরায় কক্ষের ভিতর যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করে। পাঠক! তাহা অবগত হইয়াছ। সেই পরিচারিকা দোস্তমহম্মদের গুপ্ত কথা শুনিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিল। সে সেই কথা শুনিবার জন্য বারম্বার অহল্যার নিকটে অনুনয় করিতে লাগিল। অহল্যা বন্দিনী হইয়া অবধি একটী কথাও বলে নাই। এই সময়ে অহল্যার মনে এক নবভাবের উদয় হইল;—অহল্যা দাসীকে বলিল “সে অনেক কথা। আমার অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছে, কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে, অত কথা বলিতে পারিব না।” দাসী বলিল “একটু জল আর কিছু খাবার আনিয়া দিব কি?” অহল্যা বলিল “তোমার ছোঁয়া জল হিন্দুর মেয়ে হ’য়ে কেমন করিয়া পান করিব? প্রাণ গেলেও তাহা পারিব না। যদি একটী নারিকেল দিতে পার, তবে তাহার জল পান করিতে পারি।” দাসী স্থানান্তরে গমন করিয়া বহু অন্বেষণে একটী নারিকেল আনিয়া অহল্যাকে দিল। অহল্যা বলিল “ইহা ছাড়াইব কেমন করিয়া?” দাসী পুনরায় কক্ষান্তরে যাইয়া একখানি “দা” আনিল এবং নারিকেলের ছোব্‌ড়া ছাড়াইয়া তাহা অহল্যার হাতে দিল। অহল্যা বলিল “তুমি এই গৃহে থাকিলে ত আমি নারিকেল ভাঙ্গিব না, কি, খাইব না।” পরিচারিকা গৃহের বাহিরে গেল। সেই সময়ে অহল্যা দ্বার

অর্গল বন্ধ করিল। মনে মনে ভাবিল, হে অনাথ নাথ! তোমার কৃপাবলে এখন একখানি অস্ত্র পাইলাম। এই ঘোর বিপদের সময়ে এই অস্ত্রই আমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।

রজনী প্রভাত হইল, তথাপি দ্বার খুলিল না। দাসী উচ্চৈঃস্বরে কত ডাকিল, কত ভয় দেখাইল; অহল্যা ভিতর হইতে বলিল "যদি বারম্বার বিরক্ত কর, তবে যে "দা" এখানে রহিয়াছে, তদ্দ্বারা আত্মহত্যা করিব।"

দাসী নিরুপায় হইয়া সমস্ত কথা প্রভুকে জানাইবার জন্য গমন করিল। মির্জাগোলাম অচৈতন্য, তাই কক্ষের দ্বার এখনও অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

সেনানায়কের বারম্বার চীৎকারেও কেহ দ্বার খুলিল না। স্বয়ং সেনাপতি দ্বারের অতি নিকটে যাইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "গৃহের ভিতরে যে থাক, দ্বার উন্মোচন কর। নতুবা এখনই দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

অহল্যা সেনানায়কের কথায় বিশ্বাস করে নাই; ভাবিয়াছিল ইহাও ধূর্ত্তদিগের শঠতা। কিন্তু সেনাপতির পরিচিত স্বর শ্রবণ করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল। অহল্যা দেখিল, সম্মুখে সেনাপতি; সে সহসা ছিন্নমূল তরুরন্যায় সেনাপতির পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পিতামাতা কেমন আছেন? না জানি তাঁহারা কতই কাঁদিতেছেন?"

সেনাপতি বলিল "মা! এখানে আর বিলম্ব করিও না।

শিবিকা আসিয়াছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া বাটী গমন কর।”

অহল্যা বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে “দা” খানি বাহির করিয়া সেনাপতির হস্তে দিয়া বলিল, “এখানি এখান হইতেই কৌশল করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম।” পরে শিবিকারোহণ করিল। শিবিকার অগ্রে ও পশ্চাতে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য গমন করিল।

সেনাপতি বৈরাম খাঁ মির্জাগোলামের শোচনীয় পীড়ার বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তাহাকে সে অবস্থায় সম্রাটের দরবারে প্রেরণ অসাধ্য। তিনি একজন সেনানায়ককে আদেশ করিলেন যে, আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত চিকিৎসকগণ ব্যতীত এই বাটী হইতে কেহ স্থানান্তরে না যায়। সেনাপতি আর অকারণ কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঔষধের গুণে ধীরে ধীরে মির্জাগোলামের চেতনা জন্মিল। চিকিৎসকদিগের নিবারণে, সেদিন উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে তাহাকে কেহই কোন সংবাদ জানাইল না।
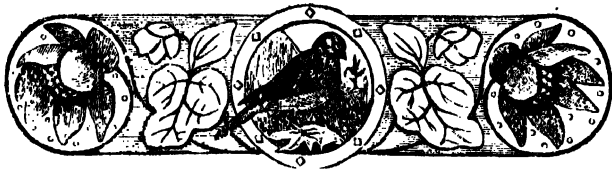
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কাম ক্রোধ জাত দোষ বিবেকে বিলয়।
ভানুর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয়॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশু ও মানবে বিভিন্নতা থাকিত না, যদি মানব-হৃদয়ে বিবেক না থাকিত। সমাজদণ্ড রাজদণ্ড প্রভৃতি হইতেও বিবেকের দণ্ড কঠোর; ইহার ভীষণ দংশনে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়।

বিবেকের নিভৃত দংশনে দোস্তমহম্মদের মনের সহসা পরিবর্ত্তন ঘটিল। সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালার ন্যায় তাহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। সে ভাবিল, সংসারে আসিয়া পাপকর্ম্ম ব্যতীত ভ্রমেও সুকার্য্য করি নাই। যে আশায় ঘোরতর পাপ-কর্ম্ম সকল করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, সে আশা পূর্ণ হইয়াছে কি? দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় এতদিন কেবল বিপথেই চলিয়াছি—সুখের অন্বেষণে ছুটিয়াছি—লাভ করিয়াছি দুঃখ। ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া অনন্ত দুঃখ আহরণ করিয়াছি। জীবনে মুহুর্ত্তকালের জন্যও পরিণাম চিন্তা করি নাই। হায়! আমার

উপায় হইবে কি? জগদীশ্বর! তুমি অনন্ত দয়াময়, এ অধম পতিত সন্তানকে কি দয়া করিবে না? যে বিষের দাহনে হৃদয় জ্বলিতেছে, সে ভীষণ জ্বালা কি নিবারিত হইবে না? নাথ, হৃদয় যে পুড়িয়া গেল! এ যন্ত্রণা যে সহিতে পারিতেছি না! কৃপাধার! শান্তিনিলয়! আমার কি গতি হইবে? আমার কৃত পাপকার্য্য সকল জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাকে শাসাইতেছে। তাহাদের প্রতিনিশ্বাসে অগ্নিকণা নির্গত হইয়া আমার আত্মাকে দগ্ধ করিতেছে। সতীর, প্রতি অশ্রু-বিন্দু শেল-সম হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। আমি করি কি,—যাই কোথায়! কোথায় গেলে এই বিষম জ্বালা নিবারিত হইবে? দয়াময়! তোমার অনন্ত রাজ্য ছাড়িয়া তোমার দৃষ্টির বাহিরে যে আর স্থান নাই, তবে যাইব কোথায়? তোমার চরণে আশ্রয় দেও নাথ! এ ঘোর পাপীকে উদ্ধার কর নাথ! বলিতে বলিতে দোস্তমহম্মদের চিরশুষ্ক নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। তাহার মরুভূমি সদৃশ হৃদয় তাহাতে কথঞ্চিৎ শীতল হইল।

অনুতাপের অশ্রুজল! তুমি পাপীর হৃদয় মরুভূমির "ওয়েসিস্!"

দোস্তমহম্মদ আবার ভাবিতে লাগিল, এ সংসার অসার, সকলই ছায়াবাজী। অসার ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতাই বা কি! এই দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিয়া, দেশে দেশে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিব, যদি পারি—হে দয়াময়! সেরূপ শক্তি আমাকে প্রদান কর,—যদি পারি এ নশ্বরজীবন পরসেবায় অতিবাহিত করিব। যে হস্ত কেবল পরের অনিষ্ট করিয়াছে,

সেই হস্তদ্বারা পরোপকার সাধন করিব। দয়াময়! আমার হৃদয়ে বলপ্রদান কর, আমাকে সুমতি দাও।

ভাবিতে ভাবিতে দোস্তমহম্মদ দণ্ডায়মান হইল, ভাবিতে ভাবিতে রাজপথে গমন করিল। রাজপথ অতিক্রম করিয়া সে অদৃশ্য হইল। দোস্তমহম্মদের নবজীবন আরম্ভ হইল

মির্জাগোলাম চেতনালাভ করিয়া পরদিন সকল সংবাদ অবগত হইল। সহসা তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; কি করিবে, কি হইবে ভাবিয়া অস্থির হইল।

বেলা প্রায় প্রহরেক হইল, এমন সময় সাত আটজন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া মির্জাগোলামকে বলিল, "বাদসাহের আদেশ, আপনাকে এখনই দরবারে গমন করিতে হইবে।"

মির্জাগোলাম কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। সে একজন ভৃত্যকে শীঘ্র শিবিকা আনয়ন জন্য আদেশ করিল। শস্ত্রধারীগণ পুনরায় বলিল, "আপনার বিরুদ্ধে সম্রাট দরবারে কি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, শিবিকারোহণে দরবারে যাইবার নিষেধ আজ্ঞা আছে। আপনাকে পদব্রজেই যাইতে হইবে।

মির্জাগোলাম সামান্য পরিচ্ছদ মাত্র পরিধান করিয়া অবনত মস্তকে শস্ত্রধারীদিগের সহিত দরবারে গমন জন্য যাত্রা করিল। মির্জাগোলাম রাজপথে বাহির হইলে, আপামর সাধারণ তাহাকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করিত, আজ কেহই সেরূপ করিল না।

যথাসময়ে দরবারে উপস্থিত হইলে, একজন রাজকর্ম্মচারী তাহাকে অপরাধীদিগের স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ

করিলেন। মির্জার বদনমণ্ডল আজ শুষ্ক, বিবর্ণ, শ্রীহীন। কলেবর কম্পিত হইতেছে, ভয়ে লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত, দৃষ্টি ভূতলের দিকে।

কিছুকাল পরে মহানুভব বাদসাহ হুমায়ুন বলিলেন, "মির্জা-গোলাম! তোমার বিরুদ্ধে অহল্যা-হরণ এবং আরও কতিপয় গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সেই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলিবার আছে কি?"

মিজার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে, অথবা সে আত্মরক্ষার্থ বলিবার কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। সে যেরূপ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, সেই রূপেই রহিল। বাদসাহ পুনরায় অপেক্ষাকৃত ক্রুদ্ধস্বরে সেই প্রশ্ন করিলেন। মির্জাগোলাম প্রত্যুত্তর দিবে কি, তাহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল।

বাদসাহ পুনরায় বলিলেন, "মির্জাগোলাম! তোমার অপ-রাধ অতি গুরুতর। দিল্লীর জনসাধারণ তোমার ভয়ে সশঙ্কিত। দুর্ব্বৃত্ত! বিগত পাপকর্ম্ম সমূহ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হও। অদ্য হইতে চিরজীবনের জন্য তুমি কারারুদ্ধ হইলে।

দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র মির্জাগোলাম অস্ফুট চীৎকার করিয়া ধরাতলে পতিত হইল। শস্ত্রিগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া কারাগারে লইয়া গেল।

কারাগারের তমসাচ্ছন্ন অপরিষ্কৃত নির্জ্জনগৃহে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

সেনাপতির সেই বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য, যে মির্জাগোলাম দত্ত

অর্থে প্রলোভিত হইয়া অহল্যাকে মিথ্যা সংবাদ (বিবি কাতেমার আবাহন) জানাইয়াছিল, গুপ্ত চরগণের অনুসন্ধানে সেও ধৃত হইয়া দরবারে উপস্থিত হইল। সুবিচারকের আদর্শ বাদসাহ হুমায়ুনের বিচারে সেও কারাগারে প্রেরিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই অনন্ত মহান,
তথাপি তোমার তরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসারে,
নাহি ছিল এতদিন তিল-অর্দ্ধ স্থান।
সমীরণে বালুকণা, সমুদ্রে সলিল ফেণা,
কোথায় ভাসিয়া যেতে কে নিত সন্ধান ?
কে ভাবিত হায় হায়, জলবিম্ব কোথা যায়,
কোথায় পতন তার কোথা অবসান :
এখন সন্তাষে যারা, ভ্রূক্ষেপে চাহেনি তারা,
পাপময়ী পৃথিবীর এই ত বিধান !
দেখিয়া সম্মুখে সিন্ধু, ভাব নাই এক বিন্দু,
বজ্রনাদ বারিধির বিকট তুফান !
আজ সে অকুল সিন্ধু, এই তার মৃদ্বিন্দু,
এই সেই তবপুরী নব বাসস্থান !
* * * *
গোবিন্দচন্দ্র দাস।

বসন্তাগমে ধরা সুন্দরী নব বেশে সজ্জিতা হইয়া লজ্জাবতী নবোঢ়া যুবতীর ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

যে হাসিলে, সকলই হাস্যময় হয়—সকলই সজীবতা প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হয়, সে কেন সদাই হাসে না ? সে কেন নিদাঘে জ্বলে,

প্রাবৃটে কাঁদে, শীতে সঙ্কুচিতা হয়? প্রকৃতির ললাটে ঐ যে পূর্ণচন্দ্র সিন্দূর ফোটার ন্যায় শোভা পাইতেছে, মুছিতে মুছিতে উহা মুছিয়া যায় কেন? প্রকৃতি সুন্দরি! অমানিশায়, তুমি ভীম-দর্শনা ডাকিনী মূর্ত্তি ধারণ কর কেন? বিশ্বনাথ! তোমার বিশ্বধাম পরিবর্ত্তনশীল কেন? জগতের প্রিয় দেব-নিবাসে অবস্থিত দেবেন্দ্রকে অসুরের দ্বারায় আর বিড়ম্বিত করিও না। নাথ! আজি তোমার সরলা অহল্যা, প্রাণেশ্বরের কাছে বসিয়া প্রাণের আনন্দে প্রাণের কথা বলিতেছে, এই স্বর্গীয় সুখভোগ হইতে উহাকে বঞ্চিতা করিওনা। উহার অদৃষ্টে আর পরিবর্ত্তন ঘটাইও না।

কি সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকা! বাদসাহের ভবন ব্যতীত দিল্লীনগরে ইহার তুল্য বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকা আর নাই। রাজ-রাজেশ্বর হুমায়ুন বহুব্যয়ে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া নব-দম্পতীকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

পাঠক! প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবলোকন কর। ঐ দেখ, কক্ষমধ্যে একাসনে উপবেশন করিয়া, জাফর ও অহল্যা কথোপকথন করিতেছেন। কিছু শুনিতে পাইতেছ কি? ঐ শুন! অহল্যা বলিতেছে—

সৎকার্য্যে সহস্র বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া কি তাহা হইতে বিরত থাকা উচিত?

জাফর। হৃদয়েশ্বরি! তোমাকে ত আমি বাধা দিতেছি না। ধীরভাবে ভাবিয়া চিন্তিয়া এরূপ বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছি মাত্র।

অহল্যা। নাথ! "আদর্শ মহান্ না হইলে, সাধনা মহীয়সী হয় না, এবং মহীয়সী সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না" এ কথা ত তুমিই কতবার বলিয়াছ!

জাফর। প্রিয়ে! তুমিও ত বলিয়াছিলে যে "হিন্দুর শাস্ত্রে যে দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে আমরা এই জ্ঞান-লাভ করিতে পারি যে, যেখানে শান্তি, সেইখানেই বিপ্লব, যেখানে অভিমান, সেইখানেই অপমান, যেখানে দেবতা, সেইখানেই দৈত্য, দানব, অসুর"। পবিত্রে! সাধনার ফল কেবলই সিদ্ধি লাভ নহে।

অহল্যা। মানুষ মাত্রেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কার্য্য সফল হয় ভালই। নতুবা আশা ভঙ্গেও অনুষ্ঠানে বিরত থাকা উচিত নহে।

নাথ! কাল-স্রোতে সকলই ভাসিয়া যাইবে, তবে ফল লাভের জন্যই বা ব্যগ্র হইব কেন?

জাফর। অহল্যা! কি উপকরণ দিয়া যে বিধাতা তোমার হৃদয় গড়িয়াছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। মাত্র এই বুঝি, উহা পৃথিবীর অসার কৃত্রিম পদার্থে নির্ম্মিত হয় নাই। প্রীতি, ভক্তি, স্নেহে উহা কুসুম হইতেও কোমল; আবার কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে, একাগ্রতায়, মানব-ধর্ম্ম রক্ষায়, উহা লৌহ অপেক্ষাও কঠিন। একাধারে কাঠিন্য ও কোমলতা কি সুন্দর! কি প্রাণারাম!

পাঠক! চল, এস্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করি। নব-দম্পতী, কোথায় সংসার ভুলিয়া, প্রেমালাপে মগ্ন থাকিবে,

তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে চির-বসন্ত বিরাজিত রহিবে, মরুভূমে উদ্যান রচিবে, নিশ্বাসে মলয়ানিল বহিবে, হাসিতে কুসুম ঝরিবে, তাহা নহে, উপরন্তু এমন কতকগুলি প্রলাপ বকিতেছে, যাহা আমি গ্রন্থকার হইয়াও বুঝিলাম না। প্রিয়-দর্শন পাঠক! তুমি যে বুঝিতে পার নাই তাহা ত সুনিশ্চিত। তবে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? ওসব প্রহেলিকা বাক্য শ্রবণের সার্থকতা কি?

পাঠক! প্রস্থানের পূর্ব্বে অহল্যার সুরম্য অট্টালিকাটী আর একবার ভাল করিয়া দেখিলে হয় না? বহুদিন গত হইল সেই সিন্ধুনদের তীরে, করাচী গ্রামের জীর্ণকুটীরে দুর্ভিক্ষ পীড়িতা, কঙ্কালাবশিষ্টা, দুঃখিনী, হুড্ডিক নন্দিনী অহল্যাকে একদিন দেখিয়াছিলে, আর আজি তাহাকে এই দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত সুরম্য অট্টালিকায় সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবিষ্টা দেখিতেছ! আবার রাজপ্রাসাদবাসী মির্জাগোলামকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ বায়ুশূন্য আলোকহীন, অপরিষ্কার ভীষণ কারাগারে পচিতে দেখিয়াছ। এখন পাঠক! তুমিও আমার স্বরে স্বর মিলাইয়া তারস্বরে বল,—বিশ্বনাথ! তোমার বিশ্বধাম কি পরিবর্ত্তনশীল!!

"সাগরে গোষ্পদ, গোষ্পদে সাগর"!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

আট বৎসর অতীত হইয়াছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত সুরম্য হর্ম্মোর সুসজ্জিত দ্বিতলকক্ষে আমীরওয়াজিদ খাঁ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। একটী সাতবৎসরের বালক ও চারি-বৎসরের একটী বালিকা সেই কক্ষে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার একটী হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত খেলানা বালকটী কাড়িয়া লইল, বালিকা কাঁদিয়া তাহার মাতামহ আমীর ওয়াজিদ খাঁর সমীপে জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে আবেদন করিল; তাঁহাকে প্রতিদিন এইরূপ শত শত আবেদনের মীমাংসা করিতে হইত। বালকও খেলানা ছাড়িবে না—বালিকাও কাঁদিতে ছাড়িবে না; শেষে মাতামহের রত্নখচিত সুবর্ণের নস্তদানি প্রাপ্ত হইয়া বালক খেলানা প্রত্যর্পণ করিল।

একটী দুই বছরের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া অহল্যার মাতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এইটী অহল্যার কনিষ্ঠ পুত্র। ওয়াজিদ খাঁ শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করি-লেন। বালক আহ্লাদে নবোদ্গত দন্ত বাহির করিয়া খল্ খল্

হাস্য করিল। ওয়াজিদ খাঁ পুনরায় তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। বিষয় বিভবের সমস্ত ভার জামাতা জাফরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমীর ওয়াজিদ খাঁ অহল্যার সন্তানগুলির সহিত শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া সর্ব্বদা সহর্ষে সময় কর্ত্তন করিতেন।

অহল্যার গল্প আমরা সম্পূর্ণ করিলাম। কিন্তু এখনও অনেক কথা বলিতে বাকী আছে। সেগুলি বলিবার পুর্ব্বে পাঠকের নিকটে দুইটী প্রশ্নের সদুত্তর চাই।

১ম প্রশ্ন। যে প্রণালীতে অহল্যার গল্প বলিলাম, তাহা পাঠকের ভাল লাগিয়াছে কি?

২য় প্রশ্ন। এইরূপ গল্প লেখা অপেক্ষা অন্য কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে সময় কর্ত্তন করা আমার কর্ত্তব্য কি না?

সমাপ্ত।